Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেনো

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবিনা আক্তার

রোলঃ 216022046227

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেনো

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবিনা আক্তার

রোলঃ 216022046227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেনো ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবিনা আক্তার, আইডিঃ 216022046227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাওঃ আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

<u>এক্সটারনালঃ</u>

মুফতিঃ মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেনো ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

সাবিনা আক্তার

আইডিঃ 216022046227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেনো 5

ভূমিকা 5

আত্মার পরিচয়ঃ..5

আত্মার জগৎ 6

আত্মশুদ্ধি অর্জনের গুরুত্ব 8

মনের ইচ্ছা (ঝোঁক) ও কল্পনার গুরুত্ব 10

পার্থিব জীবনে আত্মার পরিশুদ্ধি কেন প্রয়োজন 13

উত্তম এবং সৎ ও ধার্মিক লোকদের সহচর্য গ্রহণ করা 15

আত্মার পবিত্রতার জন্য করনীয় 18

আত্মশুদ্ধি অর্জনের গুরুত্ব 20

আত্মার শুদ্ধি মনুষ্যত্বের জাগৃতি 22

ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব ও ফজিলত 25

যে কারেণ মানবজাতির আত্মার পবিত্রতা জরুরি 27

স্বীয় নাফসের সাথে মুসলিম বান্দার আদবসমূহ.. 29

তওবাহ্.. 32

মুরাকাবা 34

মুহাসাবা.. 37

মন খারাপ কাজ করতে চাইলে কী করবেন? 46

আমলের তাওফিক থেকে কেন বঞ্চিত হই 49

ইবাদতে স্বাদ অনুভব করেন যারা.. 52

অন্তরকে মৃত বানিয়ে ফেলা.. 56

ইলমের মাধ্যমে দুনিয়া তালাশ করা.. 60

ইলম তলবের গুরুত্ব, ফযীলত ও আদব 62

ইলমে দ্বীনের ফযীলত 64

নিয়ত বিশুদ্ধ করা 66

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি 67

ইলমের জন্য দরকার মেহনত 69

আল্লাহর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হওয়া 70

তায়াক্কুলের ক্ষেত্তে ভুল পথে হাটা 73

ভালো কাজের ক্ষেত্রে রাসুল (সা.)-এর পরামর্শ 75

ভালো কাজের ইচ্ছা যেভাবে কল্যাণ বয়ে আনে 77

ভালো কাজের সওয়াব যেভাবে বৃদ্ধি পায় 79

মনের ইচ্ছা (ঝোঁক) ও কল্পনার গুরুত্ব 81

অন্তরকে মৃত বানিয়ে ফেলা 84

যে কারনে অন্তর মরে যায় 85

লোভ লালসার শিকার হওয়া 86

অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ ও প্রতিকার 88

অন্তর কঠিন হওয়ার আলামত : 89

অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ ও প্রতিকার 93

অন্তর কঠিন হওয়ার আলামত : 94

কঠিন অন্তর চেনার উপায় 98

আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেনো

ভূমিকা

পবিত্র কুরআনের আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,
“ নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে। এবং সে ব্যরথ হয়েছে, যে তাকে কলুষিত করেছে “

আত্মার পরিচয়ঃ

রূহ শব্দের অর্থ আত্মা। সুফি মুসলিমদের বিশ্বাস অনুযায়ী এটি ঐশ্বরিক ক্রিয়া বা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। কুরআনে বিভিন্নভাবে রূহকে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে রূহকে রূহ আল-কুদুস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ "পবিত্র আত্মা" এবং আর-রূহ আল-আমিন, যার অর্থ "বিশ্বস্ত আত্মা"।

আত্মাকে আরবি ভাষায় ‘রুহ’ নফস বলা হয়। প্রতিটি জীবের শরীরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আত্মা বিদ্যমান থাকে। ওই সময়টুকুকে আমরা ‘হায়াত’ বলে জানি। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে।

অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রুহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।’ (সুরা : হিজর, আয়াত : ২৯)
আত্মা আসলে কী, তা বোঝা মানুষের জন্য দুষ্কর। তাই পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ আত্মার সরল সংজ্ঞা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘তারা তোমাকে আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে।

তুমি বলো, আত্মা আমার প্রতিপালকের আদেশবিশেষ। আর তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।’ (সুরা, আয়াত : ৮৫)

আত্মা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রাণীর দেহে অবস্থান করে,
মহান আল্লাহর এই আদেশ যতক্ষণ একটি প্রাণীর দেহে বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ ওই প্রাণী জীবিত থাকবে। এর এক মাইক্রো সেকেন্ড আগেও কেউ তাকে মারতে পারবে না এবং আর এক সেকেন্ড কেউ তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু সেটার মেয়াদ সুনির্ধারিত।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৫

আত্মার জগৎ

মানবদেহে প্রবেশ করানোর আগে আত্মাগুলো আত্মার জগতে থাকে। সেখানে যার আত্মার সঙ্গে যার আত্মার পরিচয় থাকে, তাদের সঙ্গে দুনিয়াতে বন্ধুত্ব ও প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হয়। রাসুল (সা.) বলেন, ‘আত্মা স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রুহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত। (মুসলিম, হাদিস : ৬৬০২)

মানুষের কর্ম আত্মাকে পবিত্র বা অপবিত্র করে
মানুষের কৃতকর্মের ওপর ভিত্তি করে আত্মা পবিত্র বা অপবিত্র হয়। মানুষ যদি ঈমান আনে, নেক আমল করে, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে, তাহলে তাদের আত্মা পবিত্র থাকে, আর যদি তা না করে, তাহলে তাদের আত্মা অপবিত্র হয়ে যায়। এবং তা নিকৃষ্ট আত্মাতে পরিণত হয়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, মৃত্যুর সময় মানুষের কাছে ফেরেশতা আগমন করে। অতএব মুমূর্ষু ব্যক্তি নেককার হলে তারা

বলেন, হে পবিত্র আত্মা, পবিত্র দেহ থেকে প্রশংসিত অবস্থায় বের হয়ে এসো এবং আল্লাহর রহমত ও সুঘ্রাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। রুহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এভাবে আহ্বান জানাতে থাকে। অতঃপর রুহ বের হয়ে এলে তারা তা নিয়ে আসমানে আরোহণ করেন। এ রুহের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, সে কে? ফেরেশতারা বলেন, অমুক ব্যক্তি। তখন বলা হয়, পবিত্র আত্মাকে স্বাগতম, যা ছিল পবিত্র দেহে। প্রশংসিত অবস্থায় তুমি প্রবেশ করো। আল্লাহর রহমত ও সুঘ্রাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। তাকে অবিরত এ সংবাদ প্রদান করা হয়—ততক্ষণ অবধি, যখন তা মহামহিম আল্লাহ যে আসমানে অবস্থান করেন সেখানে পৌঁছে যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তি পাপাচারী হলে ফেরেশতা বলেন, হে নিকৃষ্ট দেহের নিকৃষ্ট আত্মা, নিন্দিত অবস্থায় বের হয়ে আসো এবং উত্তপ্ত গরম পানি ও রক্ত-পুঁজের দুঃসংবাদ গ্রহণ করো এবং অনুরূপ বহু বিষাক্ত বস্তুর। রুহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এভাবে আহ্বান জানাতে থাকেন। অতঃপর তাঁরা রুহসহ ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করেন। কিন্তু তার জন্য দরজা খোলা হয় না। জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে? বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, নিকৃষ্ট দেহের নিকৃষ্ট আত্মার জন্য নেই কোনো সাদর সম্ভাষণ। তুই নিন্দিত অবস্থায় ফিরে যা। কারণ তোর জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না। অতঃপর একে আসমান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তা কবরে ফিরে আসে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২৬২)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে মানুষের কৃতকর্মের ওপর ভিত্তি করে আত্মা পবিত্র-অপবিত্র হয়। যাদের আত্মা পবিত্র, পরকালীন যাত্রায় তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়, আর যাদের আত্মা অপবিত্র তাদের পরকালীন যাত্রা অত্যন্ত অপমানজনক হয়, নাউজুবিল্লাহ। কাজেই বেশি বেশি নেক আমলের মাধ্যমে আত্মার পরিচর্যা করা জরুরি। বেশি বেশি নেক আমল আত্মা পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলে।

পবিত্র আত্মার অধিকারীদের যে সংবর্ধনা দেওয়া হবে, তার ভাষ্য পবিত্র কোরআনে এভাবে এসেছে, ‘মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।’ (সুরা : ফাজর, আয়াত : ২৭-৩০)

মহান আল্লাহ সবাইকে আত্মার পবিত্রতা অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

আত্মশুদ্ধি অর্জনের গুরুত্ব

নফসের পরিশুদ্ধি দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নফসের পরিশুদ্ধি ছাড়া মানুষের ঈমান ও ইসলাম কখনো বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয় না। মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক দুইটি দিক আছে। ইসলাম যেমন মানুষের বাহ্যিক তথা বাহিরের দিককে সুন্দর ও পরিপাটি করতে চায় তেমনি আভ্যন্তরীণ বা আত্মিক দিককেও করতে চায় সুন্দর ও সম্পূর্ণ কুলুষমুক্ত। মানুষের আভ্যন্তরীণ তথা আত্মিক দিকের পরিশুদ্ধিকেই কোরআনের ভাষায় বলা হয় তাযকিয়াতুন নফস।

নফসের পরিশুদ্ধি কত বেশি প্রয়োজন তা এটাক উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি। যেমন- যদি কেউ বাহ্যিকভাবে প্রচলিত নিয়মে নামাজ রোজা হজ জাকাত পালন করে থাকে কিন্তু তার নফস পবিত্র ও পরিশুদ্ধ না হয়; তবে তার সে আমল হবে ওই ফুলের মতো, যার রং সুন্দর এবং দেখতে আকর্ষণীয় কিন্তু তার কোনো সুঘ্রাণ নেই। এগুলো হয়ে যাবে নিষ্প্রাণ ইবাদত।
ইসলামের আলোকে যদি কোনো ব্যক্তিকে পরিমাপ করতে হয় তবে দেখতে হবে তার নফস কতখানি পুতঃপবিত্র এবং কুলুষমুক্ত। কেননা মহান আল্লাহ বান্দার অন্তরকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তার বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে নয়।
মনে রাখতে হবে, একজন মানুষ তার নফসকে পবিত্রকরণ ও মনের কুলুষ দূরীকরনের মাধ্যমে নিজের আবেগ অনুভূতিকে আল্লাহ তাআলার সুন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমনভাবে নিয়োজিত করতে পারে যে, দ্বীনের বাহ্যিক ইবাদত-বন্দেগি তার আগে ও নফসের দাবিতে রূপায়িত হয়ে যাবে। কাজেই নফস পরিশুদ্ধ করা এবং এ উদ্দেশ্যে তার ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা দ্বীনের একটি অতি অপরিহার্য কর্তব্য এবং সবচেয়ে বড় জিহাদ।

দেহের যেমন রয়েছে দুটি অবস্থা সুস্থতা ও অসুস্থতা। ঠিক তেমনি আত্মারও রয়েছে সুস্থতা ও অসুস্থতা। দেহ অসুস্থ হলে যেমন চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলতে হয়, তেমনি আত্মা রোগাক্রান্ত হলেও তাকে সুস্থ বা পরিশুদ্ধ করে তুলতে হয়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْأَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا'আর শপথ নাফসের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। এরপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। অবশ্যই সেই সফলকাম হবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে। আর অবশ্যই সেই ব্যর্থ মনোরথ হবে যে নিজকে কলুষিত করবে।' (সুরা আশ-শামস : আয়াত ৭-১০)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রথমে জ্ঞানের প্রয়োজন আর মানুষকে দুই রকম জ্ঞান দেয়া হয়েছে। এক. অসৎকর্মের জ্ঞান, দুই. সৎকর্মের জ্ঞান। আয়াতের আলোকে পরিশুদ্ধির বিষয়টি দুইভাবে চিন্তা করা যায়-১. মন্দদিক : যা আখলাকে সায়্যিয়াহ বা মন্দ চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যাবতীয় পাপ, অন্যায় ও অপবিত্র কাজ থেকে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ যাবতীয় অসৎ গুণাবলী বর্জন করা। যেমন- শিরক, রিয়া, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ঘৃণা, কৃপণতা, ক্রোধ, গিবত, পরনিন্দা, চোগলখুরি, কুধারণা, দুনিয়ার প্রতি মোহ, আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, জীবনের প্রতি অসচেতনতা, অর্থহীন কাজ করা, অনধিকার চর্চা প্রভৃতি হতে নিজেকে এবং দেহ ও আত্মাকে মুক্ত রাখা। আত্মা মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হয় যখন সে তাকে পাপাচার ও সীমালংঘনের দিকে আহবান করে। কেননা এই অপরিশুদ্ধ, পাপাচারী, ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে-اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ'তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে'। এরপর তাকে বল 'তোমার কি ইচ্ছা আছে যে, তুমি পবিত্র হবে? 'আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?' (সুরা আন নাযিআত : আয়াত ১৭-১৯)

২. ভালোদিক : যা আখলাকে হাসানা বা সচ্চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উত্তম গুণাবলী দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করা। প্রশংসনীয় গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে পরিত্যাগকৃত অসৎ গুণাবলীর শূন্যস্থান পূরণ করা। সৎ গুণাবলী হল তাওহিদ, ইখলাছ, ধৈর্যশীলতা, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, তওবা, শুকর বা কৃতজ্ঞতা, আল্লাহভীতি,

আশাবাদিতা, লজ্জাশীলতা, বিনয়-নম্রতা, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন, পরস্পরকে শ্রদ্ধা-সম্মান ও স্নেহ, মানুষের প্রতি দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ, পরোপকার প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বোত্তম চরিত্র অর্জন করা। হাদিসে পাকে এসেছে-হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো-أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَকোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেনঃ সে হলো পূত-পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ, যার নাই কোন পাপাচার এবং নাই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মহমিকা ও কপটতা। (ইবনে মাজাহ)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য দোয়া করতেন। হাদিসে পাকে এসেছে-হজরত যায়িদ ইবনু আরকাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন, আমি কি তোমাদের কাছে তেমনই বলবো যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন-اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবরের আজাব থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার নফসে (অন্তরে) তাকওয়া দান কর এবং একে পরিশুদ্ধ করে দাও। তুমি সর্বোত্তম পরিশোধনকারী, মালিক ও আশ্রয়স্থল। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অনুপোকারী ইলম থেকে ও ভয় ভীতিহীন কলব থেকে; অতৃপ্ত নফসের অনিষ্ট থেকে ও এমন দোয়া থেকে যা কবুল হয় না।' (মুসলিম)

মনের ইচ্ছা (ঝোঁক) ও কল্পনার গুরুত্ব

সব ধরণের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও স্বাধীন স্বেচ্ছামূলক কাজের মূলভিত্তি হলো মনের ইচ্ছা (ঝোঁক) ও চিন্তা-ভাবনা। কেননা এর থেকে কল্পনার সৃষ্টি হয় এবং কল্পনা ইচ্ছার প্রতি আহ্বান করে। ইচ্ছাশক্তি কাজ বাস্তবে সংঘটিত হওয়া কামনা করে। এভাবে বারবার হলে অভ্যাসে পরিণত হয়।

সুতরাং উপরোক্ত স্তরগুলোর সংশোধন মনের ঝোঁক ও চিন্তা-ভাবনা থেকেই শুরু হয়। মনের ঝোঁক ও চিন্তা-ভাবনা ঠিক হলে অবশিষ্ট স্তরগুলো সঠিক হয়। মনের ঝোঁক ও চিন্তা-ভাবনার সংশোধন সর্বদা এর মালিক আল্লাহ তা'আলার দেখাশুনায় হয়ে থাকে। তাঁর সন্তুষ্ট ও ভালোবাসায় তা বাড়তে থাকে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার থেকেই সব কল্যাণ, তাঁর থেকেই সব হিদায়াত, তাঁর তাওফীকেই সব পথনির্দেশনা, তাঁর অভিভাবকত্বেই বান্দার সব সংরক্ষণ ও হিফাযত, তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেওয়াতেই সব ভ্রষ্টতা, দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা। অতএব, আল্লাহর নিদর্শন, নি'আমত, তাওহীদ, তাঁকে জানার পন্থা, তাঁর 'উবুদিয়্যাতের পন্থা বুঝা, তাঁকে হাযির (উপস্থিত), বান্দার কাজে সাক্ষ্য ও প্রত্যক্ষদর্শী মনে করা, তার ওপর আল্লাহর পর্যবেক্ষণ, তার মনের সব কামনা, বাসনা, ইচ্ছা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন, এটি যখন সে বুঝবে তখন অন্যায় করতে আল্লাহর থেকে লজ্জাবোধ করবে এবং তিনি আবার তার দোষ-ক্রটি সৃষ্টিকুলের কারো কাছে প্রকাশ করে দেয় কী না সে কারণে তাঁকে ভয় পাবে অথবা সে নিজের মনে লুকায়িত এসব দোষ-ক্রটি নিয়ে ভাববে যে মানুষ জানতে পারলে তাকে ঘৃণা করবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে বান্দার চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা অনুসারে সে কল্যাণ, হিদায়াত ও পথনির্দেশনাপ্রাপ্ত হবে।

জেনে রাখুন, মানুষের মনের কল্পনা ও ওয়াসওয়াসার আনুসঙ্গিকতা চিন্তা-ভাবনার দিকে নিয়ে যায়, অতঃপর চিন্তা-ভাবনা তাকে উপদেশের দিকে নিয়ে যায়, উপদেশ তখন তাকে ইরাদা তথা ইচ্ছার দিকে নিয়ে যায়, অতঃপর, ইচ্ছা তাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কাজের দিকে নিয়ে যায়, অতঃপর তা দৃঢ় হয়, ফলে তা 'আদা তথা অভ্যাসে পরিণত হয়। অতএব, মানুষের মনের কল্পনা ও ওয়াসওয়াসাকে দৃঢ় ও পরিপূর্ণ হওয়ার পরে তা বিচ্ছিন্ন না করে মূলের দিকে ফিরানো অধিক সহজ।

তোমার মনের বাসনাকে যদি তুমি তাড়িয়ে দাও তাহলে সে তোমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে, আর যদি মনের বাসনাকে গ্রহণ করো তখন তা মনের মধ্যে ঘূর্ণয়মান চিন্তা-ভাবনা হিসেবে দেখা দিবে। অতএব, ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করো, তাহলে তা (ইচ্ছাশক্তি) ও চিন্তাশক্তি তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। আর তুমি যদি তাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হও তাহলে তা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির সাথে ফিরে যাবে।
সাবধান! শয়তানকে তোমার চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছাশক্তির স্থানে কাজ করার ক্ষমতা দিওনা; কেননা সে তোমার চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছাশক্তিকে এমনভাবে নষ্ট করবে যা বুঝা

বড় কঠিন। সে তোমার অন্তরে নানা ধরণের ওয়াসওয়াসা দিবে এবং ধ্বংসাত্বক চিন্তা-ভাবনা ঢেলে দিবে। সে তোমার ও তোমার উপকারী চিন্তা-ভাবনার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তোমার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে ও তোমার ইচ্ছাশক্তিতে মালিকানা বানাতে তুমিই তাকে সাহায্য করেছ।

যার অন্তরে শয়তান বাসা বাঁধে তার সবধরণের চিন্তা-ভাবনা থেকে শয়তান বের হয় না অথবা নানা ধরণের অশ্লীলতা ও হারাম জিনিসের চিন্তা-ভাবনার অধিকারী হয় অথবা এমনসব কাল্পনিক অনুমান করে যার কোনো ভিত্তি নেই অথবা ভ্রান্ত সব চিন্তা-ভাবনার অধিকারী হয় অথবা তার জ্ঞানের পরিধির বাইরে এমন সব জিনিসের চিন্তা করে যা অনুধাবন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তখন শয়তান তার অন্তরে সেসব কাল্পনিক চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় যার কোন কূল-কিনারা নেই এবং সে এর শেষ সীমানায় পৌঁছতে পারে না। তখন তার চিন্তা-ভাবনার ময়দানে সেসব কাল্পনিক বিয়ষগুলো ঘূর্ণায়মান করতে থাকে।

এসব কিছু সংশোধনের উপায় হলো: তুমি তোমার চিন্তা শক্তিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উপকারী ভাবনার কাজে ব্যাপৃত রাখো, যেমন তাওহীদের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানসমূহ, তার অধিকারসমূহ, মৃত্যু ও এর পরবর্তী জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ, কাজের দোষ-ত্রুটি ও তা থেকে উত্তরণের উপায়, ইচ্ছাশক্তি ও প্রত্যয়েয় ক্ষেত্রে তোমার উপকারে আসে এমন সব চিন্তা-ভাবনা করো এবং যেসব জিনিস তোমাকে ক্ষতি করে সেসব জিনিসের ইচ্ছা ছুঁড়ে ফেলো।

‘আরেফীন তথা আল্লাহর পরিচয় লাভকারী আলিমদের মতে, খিয়ানতের আশা করা ও মনের চিন্তা-ভাবনায় খিয়ানতের কাজ করা অন্তরের জন্য স্বয়ং খিয়ানত করার চেয়েও অধিক মারাত্মক ও ক্ষতিকর। বিশেষ করে অন্তর যখন খিয়ানতের কাজ করে তখন অন্তরে খিয়ানতের আকাঙ্খা করা মানে এ কাজে অন্তরকে ব্যাপৃত রাখা ও খিয়ানতের দ্বারা অন্তরকে ভরে রাখা এবং তার চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছা সবকিছুই খিয়ানতের হবে।

পার্থিব জীবনে আত্মার পরিশুদ্ধি কেন প্রয়োজন

জ্ঞানগত পর্যালোচনা, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ, শিক্ষিত, উদাসীন ও আলেমসহ মুসলিম সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির সঙ্গে মেশার ফলে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে সব শ্রেণির মুসলমানের জন্য সত্যিকার ঈমানি শিক্ষা ও অনুশীলন অপরিহার্য, যা তাদের আল্লাহমুখী করবে এবং যার মাধ্যমে তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হবে দুনিয়ার মোহ ও আত্মপূজা থেকে। ঈমানি শিক্ষা ও ঈমানের অনুশীলন মানুষকে বস্তু, প্রবৃত্তি ও কল্পনার আনুগত্য থেকে মুক্তি দেয়। তা মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতে আবদ্ধ করে এবং পবিত্র রাখে বিশ্বাসকে শিরক থেকে, অন্তরকে কপটতা থেকে, জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে, চোখকে খেয়ানত থেকে, কথাকে অর্থহীন বাক্যব্যয় থেকে, ইবাদতকে প্রদর্শন থেকে, লেনদেনকে প্রতারণা থেকে এবং জীবনকে দ্বন্দ্ব থেকে। আর এই পুরো বিষয়টিকে এককথায় বলা হয়, তাজকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি।

ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য মানুষের আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করিয়েছেন। সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।
’ (সুরা : শামস, আয়াত : ৭-১০)

আরবি তাজকিয়া শব্দটি জাকাত থেকে উদ্ভাবিত। অর্থ পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। আত্মার পবিত্রতা হলো কপটতা ও পাপাচার থেকে মুক্তি লাভ। আর প্রবৃদ্ধি হলো ঈমান ও উত্তম গুণাবলিতে নিজেকে সুসজ্জিত করা।

আধ্যাত্মিক সাধকদের ভাষায় তাকে ‘তাখাল্লিয়া’ ও ‘তাহাল্লিয়া’ বলা হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আত্মশুদ্ধিকে কোরআন ও হিকমত শিক্ষাদানের মতো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মৌলিক কাজ ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসুল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতগুলো তাদের কাছে তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৪)

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। ফলে তাঁর হাতে তৈরি হয়েছিল এমনকটি দল, যারা ঈমান, ইবাদত, নীতি-নৈতিকতা ও আল্লাহর সংগ্রামের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ও দৃষ্টান্তহীন।
আর শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়।
পার্থিব জীবনে মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা, সুরা ফাতহর শেষে আল্লাহ যে গুণাবলি বর্ণনা করেছেন তা অর্জন করা এবং জীবনে ঈমানের শাখা হিসেবে বর্ণিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা যেন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। সর্বোপরি সে যেন ইহসানের স্তরের উপনীত হয়, যার পরিচয় রাসুলুল্লাহ (সা.) এভাবে দিয়েছেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে (মনে করবে) তিনি তোমাকে দেখছেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০)
মানুষের জন্য আবশ্যক হলো অন্তরের ত্রুটি, আত্মার ব্যাধি, প্রবৃত্তির তাড়না, শয়তানের প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেন সে এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। চিকিৎসার চেয়ে আত্মরক্ষাই শ্রেয়। কিন্তু মানুষ কিভাবে চিকিৎসা করবে, যখন সে নিজেই রোগে নিমজ্জিত। আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার আরোগ্য নেই। জ্ঞানীরা রোগ ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে অবগত আর মূর্খরা রোগ ও আরোগ্যের ব্যাপারে উদাসীন। দুঃখের বিষয় হলো, মানুষ শারীরিক ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন এবং অন্তরের ব্যাধি সম্পর্কে উদাসীন। যখন তাকে সতর্ক করা হয়, তখন সে বলে, অন্তরের চিকিৎসা কোথায় পাওয়া যাবে। ধরে নিলাম, আলেমরা অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসা করবেন। কিন্তু তাঁরাই তো বহু রোগের আকর। নাউজুবিল্লাহ!
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদীকে কখনো কল্যাণশূন্য করবেন না। বস্তুবাদী পৃথিবীর নৈরাজ্যের মধ্যেও আল্লাহর বহু বান্দা তাঁর আনুগত্য, ভালোবাসা ও সান্নিধ্য লাভে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরাই মানুষকে বিশুদ্ধ ঈমান, নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য ও নিখাঁদ ভালোবাসার দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন।

মানুষের জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহ প্রেমের আগুনে পুড়ে খাঁটি হওয়া। যেন তারা শয়তানের পূজারি থেকে আল্লাহর বান্দা, অর্থ-বিত্তের পূজারি থেকে পরকালের কল্যাণপ্রত্যাশী হতে পারে। তাদের জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহর আনুগত্যে সৎ হওয়া এবং মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা। এটাই তাসাউফের মূলকথা, তাকওয়া তথা

আল্লাহভীতিরও সারকথা এটাই, দ্বিনদারির ব্যাখ্যাও এটা। এই কথার প্রতি ইঙ্গিত মেলে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে—'আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা আল্লাহভীতি অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ১২৮)

আত্মিক পরিশুদ্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ভালোবাসা ও সান্নিধ্য লাভের এমন পথ যার গন্তব্য সুস্পষ্ট, যা পরিচ্ছন্ন, যা আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত, যা আল্লাহর রাসুলের সুন্নতের অনুসারী, পূর্বসূরি বুজুর্গরা যে পথে চলেছেন। একই সঙ্গে যে পথ মুক্ত হবে সব ধরনের বিদআত, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিকৃতি থেকে। যে পথে চললে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, হৃদয় প্রশান্ত হয়, মনে সজীবতা আসে, ঈমান দৃঢ় হয়, আমলের সৌন্দর্য বাড়ে, চরিত্র সুন্দর হয়, সর্বোপরি মনুষ্যত্ব তৈরি হয়। ঈমান ও ইসলামের পরিপন্থী কোনো পথ ও পদ্ধতি উদ্দেশ্য নয়।

আল্লাহ সবার ঈমান দৃঢ় করেন এবং আত্মা পরিশুদ্ধ করেন। আমিন।

উত্তম এবং সৎ ও ধার্মিক লোকদের সহচর্য গ্রহণ করা

কারণ, তারা এমন লোকজন যাদের সঙ্গী ও সাথীগণ কখনও দুর্ভাগা হন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন:

﴿وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا ٢٨﴾ [الكهف: ٢٨]

"(হে রাসূল!) নিজেকে তুমি রাখবে তাদেরই সঙ্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের রবকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না; যার চিত্তকে বা অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।" [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ২৮]

ইমাম আহমাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»

“একজন মানুষ তার বন্ধুর দীনের ওপরেই বড় হতে থাকে, কাজেই তোমাদের প্রত্যেকে যেন পর্যবেক্ষণ করে দেখে সে কার বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছে।”

ইমাম মালিক ইবন দীনার বলেন,

إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار

“ধার্মিক লোকদের সাথে তোমার পাথর বহণ করাও পাপাচারী ও লম্পট লোকদের সাথে মিষ্টি খাওয়া থেকে উত্তম।” অতএব, ভালো, উত্তম, সৎ ও ধার্মিক লোকদের সহচর্য গ্রহণ করবে এবং তাদের সাহচর্য লাভের চেষ্টা করবে, যাদের দেখা হলে আল্লাহকে স্মরণ আসে। কারণ, তাদের সাহচর্য অন্তরের জীবন। একজন সালাফ বলেছেন:

إن كنت لألقى الرجل من إخواني فأكون بلقياه عاقلاً أياماً

“আমি কখনও কখনও আমার বন্ধুদের কারও সাথে সাক্ষাৎ করি, অতঃপর তার সাথে এ সাক্ষাতের মাধ্যমে অনেক দিন বুদ্ধিমান হয়ে থাকি।”

অন্য একজন সালাফ বলেছেন:

كنت أنظر إلى أخ من إخواني فأعمل على رؤيته شهراً

“আমি আমার বন্ধুদের মধ্য থেকে কোনো একজনের দিকে তাকিয়ে এক মাস আমল করতে সমর্থ হই।”

এ সব হচ্ছে অন্তরের প্রতিষেধক এর মূলনীতি এবং আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন মাধ্যম। তাই তা উপলব্ধির চেষ্টা এবং তা ভালোভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা কর। কারণ, প্রকৃত সমৃদ্ধি ও কল্যাণ অন্তরের পরিশুদ্ধতা ও তার সুস্থতার ওপর নির্ভরশীল। যাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়েছে এবং যাদের অভ্যন্তর ভাগ সুস্থ হয়েছে তাদের থেকে অধিক পরিপূর্ণ, অধিকতর সৌভাগ্যবান, অধিক উত্তম, অধিক সুখী, অধিক আনন্দময় ও অধিক পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি আর কেউ নেই।

‘আরশে আযীমের মালিক মহান আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি, যারা তাঁর কাছে খাঁটি ও অটুট অন্তর নিয়ে আগমন করবেন, আমরা যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।

﴿يَوۡمَ لَا يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ سَلِيمٖ ٨٩﴾ [الشعراء :٨٨، ٨٩]

“সেদিন, যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।” [সূরা আশ- শু‘আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]

আবারও ‘আরশে আযীমের মালিক মহান আল্লাহর কাছে দো‘আ করি, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁর শরী‘আতের ওপর সুদৃঢ় থাকার তাওফীক দান করেন এবং তিনি আমাদেরকে যেন একনিষ্ঠ অন্তর এবং সৎ আমল করার তাওফীক দান করেন এবং আমাদের অন্তরে যেন তাকওয়া দান করেন এবং যেন তা পবিত্র করেন এবং তিনিই অন্তরের উত্তম পবিত্রকারী।

পরিশেষে আমাদের দাবী থাকবে যে, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। আর আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং জাহান্নাম থেকে সতককারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার পরিজন এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি রহমত নাযিল করুন। (আমিন)

আর নিম্নের দো‘আ বেশি বেশি পাঠ করবে:

«اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»

“হে আল্লাহ! আমার গুনাহকে পানি বরফ ও শিশির দ্বারা ধুয়ে পবিত্র কর।”

কারণ, গুনাহ ছোট হোক বা বড় হোক তা অন্তরকে নোংরা এবং আবর্জনাযুক্ত করে তুলে। তাই অন্তরকে পবিত্র করা প্রয়োজন।

আত্মার পবিত্রতার জন্য করনীয়

মানুষের আত্মা পবিত্র করার জন্য বেশি বেশি নামাজ পড়া দরকার। যদিও আত্মা পবিত্র করার আরও অনেক আমল ও মাধ্যম রয়েছে।
তবে আত্মা পবিত্র করার ক্ষেত্রে নামাজের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা, মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন, ‘নিশ্চয় নামাজ সব অশ্লীল ও পাপ কর্ম থেকে বিরত রাখে।
’ -সূরা আনকাবুত: ৪৫

এই আয়াতের অালোকে বলা চলে, মানুষের আত্মাকে পবিত্র করতে হলে নামাজের আমল সর্বাগ্রে দরকার। মানুষ মিথ্যা কথা বললে, মন্দ কাজ করলে, মনে হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, অহঙ্কার ইত্যাদি থাকলে, আত্মা কখনও পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
তাই আত্মাকে পবিত্র করতে হলে সবাইকে নিয়মিত নামাজ পড়তে হবে।

কোনো ব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নামাজ পড়ি।
তাহলে, তার ভালো-মন্দ সব কাজ করার সম্ভাবনা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। যেমন, যে ব্যক্তি বলবে আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নামাজ পড়ি। তার নামাজ পড়ার সময় হলে, সে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নামাজ পড়ল। সে ব্যক্তি নামাজ পড়ার পর, তার যদি মিথ্যা কথা বলা বা মন্দ কাজ করার মাধ্যমে লাভবান হওয়ার সময় হয়, সে তখন মিথ্যা কথা বলে কিংবা মন্দ কাজ করেও তার লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, আবার নাও থাকতে পারে, কিন্তু সুযোগ একটি থেকে যায়।

যেমন, সে তখন মিথ্যা কথা বা মন্দ কাজ করে লাভবান হয়ে, সে মনে মনে বলবে যে, আবার আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নামাজ পড়লে, আল্লাহ আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে, আমার সব পাপ ক্ষমা করে দিবেন।

এভাবে মানুষের ভালো-মন্দ উভয় কাজ করার সুযোগ থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন, ‘আর আমার দাসত্বের জন্যই আমি মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি। ’ -সূরা জারিয়াত: ৫৬

বস্তুত আল্লাহতায়ালা কারও মুখাপেক্ষী নয়, আল্লাহর সৃষ্টির সব বস্তুই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহতায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও হুকুম পালন করার জন্য। সব মানুষ আল্লাহর দাস। মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন করবে, আল্লাহর ইবাদত করবে।

লেখার শুরুতে বলা হয়েছে, মানুষের আত্মাকে পবিত্র করার জন্য সবাইকে নামাজ পড়তে হবে। নামাজের মাধ্যমে কীভাবে আত্মা পবিত্র থাকবে এর একটি উদাহরণ এমন হতে পারে- কোনো ব্যক্তি আসরের নামাজ পড়ার জন্য অজু করল, সে ব্যক্তি অজু করে আসরের নামাজ পড়ে মনে মনে ভাবল, আমার তো এখনও অজু আছে, আমি এই অজু দিয়ে মাগরিবের নামাজও পড়ব। তাহলে, সাধারণ অভ্যাসবশত ওই ব্যক্তি আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কোনো মিথ্যা কথা বলা বা মন্দ কাজ করবে না। আবার যদি ব্যক্তিটি মাগরিবের নামাজ পড়ে, আর মনে মনে স্থির করে নেয়- যেহেতু অজু আছে, তাই ইশার নামাজও পড়ব। সেই ব্যক্তি ইশার নামাজ পড়ার পূর্ব পর্যন্ত, মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকবে এবং মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। সুতরাং এভাবে সে নামাজ পড়তে পড়তে এবং মিথ্যা কথা বলা ও মন্দ কাজ-কর্ম করা থেকে বিরত থাকতে থাকতে, তার আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে।

আর যাদের আত্মা একবার পবিত্র হয়ে যায়, তাদের দ্বারা সৎকর্ম করা ব্যতীত মিথ্যা কথা বলা বা মন্দ কাজ-কর্ম করা কখনও সম্ভব নয়। তারা সবসময় আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকে।

আত্মশুদ্ধি অর্জনের গুরুত্ব

নফসের পরিশুদ্ধি দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নফসের পরিশুদ্ধি ছাড়া মানুষের ঈমান ও ইসলাম কখনো বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয় না। মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক দুইটি দিক আছে। ইসলাম যেমন মানুষের বাহ্যিক তথা বাহিরের দিককে সুন্দর ও পরিপাটি করতে চায় তেমনি আভ্যন্তরীণ বা আত্মিক দিককেও করতে চায় সুন্দর ও সম্পূর্ণ কুলুষমুক্ত। মানুষের আভ্যন্তরীণ তথা আত্মিক দিকের পরিশুদ্ধিকেই কোরআনের ভাষায় বলা হয় তাযকিয়াতুন নফস।

নফসের পরিশুদ্ধি কত বেশি প্রয়োজন তা এটাক উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি। যেমন- যদি কেউ বাহ্যিকভাবে প্রচলিত নিয়মে নামাজ রোজা হজ জাকাত পালন করে থাকে কিন্তু তার নফস পবিত্র ও পরিশুদ্ধ না হয়; তবে তার সে আমল হবে ওই ফুলের মতো, যার রং সুন্দর এবং দেখতে আকর্ষণীয় কিন্তু তার কোনো সুঘ্রাণ নেই। এগুলো হয়ে যাবে নিষ্প্রাণ ইবাদত।

ইসলামের আলোকে যদি কোনো ব্যক্তিকে পরিমাপ করতে হয় তবে দেখতে হবে তার নফস কতখানি পুতঃপবিত্র এবং কুলুষমুক্ত। কেননা মহান আল্লাহ বান্দার অন্তরকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তার বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে নয়।

মনে রাখতে হবে, একজন মানুষ তার নফসকে পবিত্রকরণ ও মনের কুলুষ দূরীকরনের মাধ্যমে নিজের আবেগ অনুভূতিকে আল্লাহ তাআলার সুন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমনভাবে নিয়োজিত করতে পারে যে, দ্বীনের বাহ্যিক ইবাদত-বন্দেগি তার আগে ও নফসের দাবিতে রূপায়িত হয়ে যাবে। কাজেই নফস পরিশুদ্ধ করা এবং এ উদ্দেশ্যে তার ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা দ্বীনের একটি অতি অপরিহার্য কর্তব্য এবং সবচেয়ে বড় জিহাদ।

দেহের যেমন রয়েছে দুটি অবস্থা সুস্থতা ও অসুস্থতা। ঠিক তেমনি আত্মারও রয়েছে সুস্থতা ও অসুস্থতা। দেহ অসুস্থ হলে যেমন চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলতে হয়, তেমনি আত্মা রোগাক্রান্ত হলেও তাকে সুস্থ বা পরিশুদ্ধ করে তুলতে হয়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْأَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ

خَابَ مَنْ دَسَّاهَا'আর শপথ নাফসের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। এরপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। অবশ্যই সেই সফলকাম হবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে। আর অবশ্যই সেই ব্যর্থ মনোরথ হবে যে নিজকে কলুষিত করবে।' (সুরা আশ-শামস : আয়াত ৭-১০)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রথমে জ্ঞানের প্রয়োজন আর মানুষকে দুই রকম জ্ঞান দেয়া হয়েছে। এক. অসৎকর্মের জ্ঞান, দুই. সৎকর্মের জ্ঞান। আয়াতের আলোকে পরিশুদ্ধির বিষয়টি দুইভাবে চিন্তা করা যায়-১. মন্দদিক : যা আখলাকে সায়্যিয়াহ বা মন্দ চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যাবতীয় পাপ, অন্যায় ও অপবিত্র কাজ থেকে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ যাবতীয় অসৎ গুণাবলী বর্জন করা। যেমন- শিরক, রিয়া, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ঘৃণা, কৃপণতা, ক্রোধ, গিবত, পরনিন্দা, চোগলখুরি, কুধারণা, দুনিয়ার প্রতি মোহ, আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, জীবনের প্রতি অসচেতনতা, অর্থহীন কাজ করা, অনধিকার চর্চা প্রভৃতি হতে নিজেকে এবং দেহ ও আত্মাকে মুক্ত রাখা। আত্মা মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হয় যখন সে তাকে পাপাচার ও সীমালংঘনের দিকে আহবান করে। কেননা এই অপরিশুদ্ধ, পাপাচারী, ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে-اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ'তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে'। এরপর তাকে বল 'তোমার কি ইচ্ছা আছে যে, তুমি পবিত্র হবে? 'আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?' (সুরা আন নাযিআত : আয়াত ১৭-১৯)

২. ভালোদিক : যা আখলাকে হাসানা বা সচ্চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উত্তম গুণাবলী দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করা। প্রশংসনীয় গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে পরিত্যাগকৃত অসৎ গুণাবলীর শূন্যস্থান পূরণ করা। সৎ গুণাবলী হল তাওহিদ, ইখলাছ, ধৈর্যশীলতা, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, তওবা, শুকর বা কৃতজ্ঞতা, আল্লাহভীতি, আশাবাদিতা, লজ্জাশীলতা, বিনয়-নম্রতা, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন, পরস্পরকে শ্রদ্ধা-সম্মান ও স্নেহ, মানুষের প্রতি দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ, পরোপকার প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বোত্তম চরিত্র অর্জন করা। হাদিসে পাকে এসেছে-হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা

করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো-أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَকোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেনঃ সে হলো পূত-পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ, যার নাই কোন পাপাচার এবং নাই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মহমিকা ও কপটতা। (ইবনে মাজাহ)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য দোয়া করতেন। হাদিসে পাকে এসেছে-হজরত যায়িদ ইবনু আরকাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন, আমি কি তোমাদের কাছে তেমনই বলবো যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন-اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা, অলসতা, কাপূরষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবরের আজাব থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার নফসে (অন্তরে) তাকওয়া দান কর এবং একে পরিশুদ্ধ করে দাও। তুমি সর্বোত্তম পরিশোধনকারী, মালিক ও আশ্রয়স্থল। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অনুপোকারী ইলম থেকে ও ভয় ভীতিহীন কলব থেকে; অতৃপ্ত নফসের অনিষ্ট থেকে ও এমন দোয়া থেকে যা কবুল হয় না।' (মুসলিম)

আত্মার শুদ্ধি মনুষ্যত্বের জাগৃতি

আল্লাহ তাআলা তাঁর গুপ্ত ও রহস্যময় অপার শক্তির কুশলতায় মানবসত্তাকে বিকশিত করেছেন। প্রাণের ও মনের সমন্বিত উপলব্ধির জন্যই মানুষ সৃষ্টির সেরা। বলা হয় 'প্রাণ থাকলেই প্রাণী, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।' আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অধ্যাত্ম চেতনা, অন্যদিকে মানবজীবনের মূল মর্ম হলো আত্মশুদ্ধি। তাই মানুষের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক সুগভীর। পৃথিবীতে আগত সব নবী-রাসুল ও আসমানি কিতাব বা ঐশী ধর্মগ্রন্থের একমাত্র মিশন ছিল মানবাত্মার সংশোধন। মানবাত্মা হলো শাসক, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার প্রজা। যখন শাসক ভালো হয়, তার প্রজারাও ভালো হয়,

আর যখন শাসক খারাপ হয়, তার প্রজারাও খারাপ হয়। আত্মার সংশোধন শুধু একজন মানুষের জন্যই নয়; বরং ইহকালীন জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি এর ওপরই নির্ভর করে। মানুষের অধ্যাত্ম চেতনা ও আত্মশক্তির অনন্য চালিকাশক্তি হলো 'কাল্ব' বা অন্তঃকরণ। এর সুস্থতার সঙ্গে দেহ-মনের সুস্থতা সম্পৃক্ত। রাসুলুল্লাহ (সা.) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, 'সাবধান! নিশ্চয়ই প্রত্যেক দেহে একটি গোশতের টুকরা রয়েছে। যখন সেটি ঠিক থাকে, তখন দেহের অন্য অঙ্গগুলোও ঠিক হয়ে যায়। আর যদি তা বিনষ্ট হয়, তাহলে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। এর নাম হলো কাল্ব বা মানবাত্মা।' (বুখারি ও মুসলিম)

মানুষের আত্মাই দেহের নিয়ন্ত্রক। অন্তর যদি নিজে কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে, তবে সারা শরীরের কার্যকলাপও সঠিক থাকবে। পক্ষান্তরে অন্তর যদি সঠিকভাবে কাজ না করে, তবে শরীরের সব ব্যবস্থাপনাও বিনষ্ট হবে। তাই সবার আগে আত্মাকে ঠিক করা দরকার। আত্মার ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে তার স্বচ্ছতা ও মলিনতা। লোহা কিছুদিন মাটিতে পড়ে থাকলে যেমন মরিচা ধরে, নষ্ট হয়ে যায়, তদ্রূপ আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন না হলে বা আত্মাকে সঠিকভাবে পরিচালনা না করা হলে লোহার মতোই মরিচাপ্রাপ্ত হয়ে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এর মধ্যে অসৎ চিন্তা এবং কুধারণা বাসা বাঁধতে থাকে। একপর্যায়ে তা আর সঠিকভাবে কাজ করে না। এভাবেই মানুষ তার সৎ কর্ম করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। নবী করিম (সা.) যথার্থই বলেছেন, 'লোহার মতো আত্মাও মরিচাপ্রাপ্ত হয়।' (তিরমিজি)

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার শক্তিই নফস বা কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে, মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করতে পারে এবং এর মাধ্যমেই রুহানি চেতনা বিকশিত হয়। মানুষের অধ্যাত্ম চেতনা ও আত্মশুদ্ধি এমনই এক প্রবল প্রখর শক্তি। যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হজরত ইমাম গাজ্জালি (র.) বলেছেন, 'মানুষের আত্মা স্বচ্ছ অসির মতো উজ্জ্বল। আর মন্দ স্বভাব ধূম্র ও অন্ধকারের মতো মলিন। তা ক্রমশ আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আত্মাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে এবং একটি কালো আবরণ সৃষ্টি করে। যার ফলে সে আল্লাহর দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষের মহৎ গুণ ও সৎ স্বভাব উজ্জ্বল আলোকতুল্য। যা আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক সকল মলিনতা ও পাপ বিদূরিত করে আত্মার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।' (কিমিয়ায়ে সা'আদত)

অন্তঃকরণ হলো আল্লাহর নূরের অবস্থানস্থল। এর দ্বারা মানুষ প্রকৃত মানুষ হিসেবে পরিচয় লাভ করে এবং দেহের পরিশুদ্ধি লাভ হয়। অন্তরের পরিচ্ছন্নতার জন্য নবী করিম (সা.) সর্বদা আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে পরিষ্কার করে দিন যেমনিভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়।' (বুখারি) অন্তরের পরিচ্ছন্নতার জন্যও বিশেষভাবে প্রচেষ্টা করে তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ! এমন অন্তর থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই, যে অন্তরে বিনয়-নম্রতা নেই।' (মুসলিম)

যত ইবাদতই মানুষ পালন করুক না কেন, এর লক্ষ্য হওয়া উচিত অন্তরের বিশুদ্ধতা। ইমান ও আমলের যথার্থ সমন্বয়ের পর আত্মার জগতে দীপ্তি, পরিতৃপ্তির মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের উপায় হলো অধ্যাত্ম চেতনা। অন্তর পরিশুদ্ধ হলে অন্য কাজকর্মও সঠিকভাবে আদায় হবে। এ জন্য অন্তরের শুদ্ধকরণ আগে জরুরি। প্রাণিজ সত্তা, আত্মিক শক্তি আর মানবীয় গুণাবলিতে বিকশিত মানুষই পরিপূর্ণ মানুষ বা 'ইনসানে কামিল'— এখানেই রয়েছে মানব সৃষ্টির রহস্য ও মানুষের কর্মের চেতনা। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের শিক্ষায় আত্মার উন্নতি ও আত্মশুদ্ধির প্রেরণা রয়েছে। এ জন্যই বলা হয় 'যে নিজেকে চিনেছে সেই তার প্রভুকে চিনেছে।' ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই সেই সফলকাম হয়েছে—যে নিজের নফস বা আত্মাকে কলুষতা থেকে মুক্ত করেছে। আর সে অকৃতকার্য হয়েছে যে নফসকে কলুষিত করেছে।' (সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৯-১০)

প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধ ও বুদ্ধির মানুষ জাগতিক জীবনে হয় সফল ও অনুসরণীয়। অস্বচ্ছ ময়লাযুক্ত অন্তর নিয়ে কখনো আল্লাহকে পাওয়া যায় না বা ভালো কিছু করা যায় না। তাই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে হলে এবং বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে হলে আত্মশুদ্ধি অবশ্যই জরুরি। আত্মিক পরিশুদ্ধতা ও অধ্যাত্ম শক্তি ছাড়া মানবজীবন ব্যর্থ ও বিফল। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে।' (সূরা শোআরা, আয়াত: ৮৮-৮৯)

প্রকৃত মানুষ ও মনুষ্যত্ব পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যার অপর নাম বিবেক। এরই অভাবে মানুষ হয় পশু ও অধম। এ জন্যই দেখা যায়, শিশু জন্মালে দোয়া চাওয়া হয় যেন মানুষ হয়, 'নব দম্পতির প্রতি আশীর্বাদ ও শুভাশিস 'যেন মানুষ হয়', তবে কি এরা মানুষ নয়? মূলত এখানে প্রত্যাশা হলো প্রকৃত মনুষ্যত্ব, রুহানি শক্তি যে মানুষের চেতনা, সেই মানুষ। আবার মানুষের মৃত্যুতে সবাই বলাবলি করে, 'বড় ভালো লোক ছিল।' কেননা সবাই চায় দয়াময় আল্লাহর দরবারে সে যেন আদর্শ মানুষ হিসেবে

কৃতকার্য হয়; দুনিয়ার প্রতি যে নির্মোহ! তাই মানুষের পার্থিব ধন-সম্পদ ও উন্নতি যতই হোক না কেন, মানবাত্মার পরিশুদ্ধির উৎকর্ষে মনুষ্যত্বের জাগৃতি বেশি হওয়া দরকার।

ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব ও ফজিলত

আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি সব আবিলতা ও পঙ্কিলতামুক্ত। তাঁর পবিত্র নামগুলোর অন্যতম হচ্ছে 'সুব্বুহুন' (পবিত্রতম), 'কুদ্দুসুন' (অতি পবিত্র ও মহা পবিত্রকারী)। আল্লাহ চান মানবের পূতপবিত্র জীবনযাপন। তিনি বলেন, 'হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো শুধু চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।' (সুরা-৩৩ আহজাব, আয়াত: ৩৩)। তিনি আরও বলেন, 'বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান।' (সুরা-৫ মায়িদা, আয়াত: ৬)।

ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো পবিত্রতা। পবিত্রতা মানে জীবনব্যাপী পবিত্রতা। বিশ্বাসের পবিত্রতা, কর্মের পবিত্রতা, শারীরিক পবিত্রতা, মানসিক পবিত্রতা, আর্থিক পবিত্রতা, বাহ্যিক পবিত্রতা, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা; ভাষা তথা বাক্য ও শব্দের পবিত্রতা, রুচির পবিত্রতা, দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির পবিত্রতা এবং পরিবেশ–প্রতিবেশের পবিত্রতা। শ্রবণে পবিত্রতা, দর্শনে পবিত্রতা ও চিন্তায় পবিত্রতা পবিত্র জীবনযাপনের পূর্বশর্ত ও সহায়ক বটে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক।' (মুসলিম, মিশকাত, পৃষ্ঠা: ৩৮)।

ইসলামের শুরু হয় পবিত্রতা দিয়ে। ইসলামে ইমান বা বিশ্বাসের মূল কথা হলো 'কালিমা তাইয়েবা'। কালিমা তাইয়েবা নামের মানে হলো 'পবিত্র বাক্য' বা 'পবিত্রকারী বাণী'। এই ঘোষণা দ্বারা বিশ্বাস পবিত্র হয়; মানুষ পাপপঙ্কিলতা, কুফর, শিরকসহ সব ধরনের অন্যায়–অত্যাচার বা পাপাচার থেকে মুক্ত হয়, তাই এর নাম কালিমা তাইয়েবা তথা 'পবিত্র কথা' বা 'পবিত্রকারী বাক্য'।

ইসলামি বিধানমতে, আত্মিক পবিত্রতার পাশাপাশি শারীরিক পবিত্রতাও জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম সার্বক্ষণিক পবিত্রতা রক্ষায় গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ইবাদতে পবিত্রতার

শর্তারোপ করেছে। নামাজ পড়া, কোরআন মাজিদ স্পর্শ করা ও কাবা শরিফ তাওয়াফ করা—এই তিন ইবাদত সম্পাদনের জন্য পবিত্রতাকে পূর্বশর্ত হিসেবে ফরজ করা হয়েছে। নামাজের **১৩**টি অপরিহার্য ফরজের প্রথম পর্বের বাধ্যতামূলক সাতটি শর্তের প্রথম তিনটিই হলো পবিত্রতাবিষয়ক—শরীর পাক, কাপড় পাক ও নামাজের জায়গা পাক। নামাজভঙ্গের **১৯**টি কারণের একটি হলো 'নাপাক জায়গায় সিজদা করা

পবিত্রতা অর্জনের প্রধান দুটি পন্থা হলো অজু ও গোসল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এবং তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তোমাদের পবিত্র করার জন্য।' (সুরা-৮ আনফাল, আয়াত: ১১)। 'এবং আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।' (সুরা-২৫ ফুরকান, আয়াত: ৪৮)। অজুর চারটি ফরজ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনেরা! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করবে এবং পা টাকনু পর্যন্ত ধৌত করবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও ...অথবা পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।' (সুরা-৫ মায়িদাহ, আয়াত: ৬)। অজু ও গোসলের প্রয়োজনে পানি ব্যবহারে অপারগতায় পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম সম্পন্ন করা হয় (কুদুরি)।

মন ও স্থানের পবিত্রতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ, 'আমার সঙ্গে কোনো শরিক স্থির কোরো না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রেখো।' (সুরা-২২ হজ, আয়াত: ২৬)। পবিত্র পরিচ্ছদ গ্রহণ বা পোশাক পবিত্রকরণ ও আবিলতামুক্ত হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তাআলার আদেশ, 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্ক করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন, অপবিত্রতা পরিহার করে চলুন।' (সুরা-৭৪ মুদ্দাছছির, আয়াত: ১-৪)। ইবাদতকারীদের জন্য ইবাদতের স্থান আল্লাহর ঘর পবিত্র রাখার নির্দেশনা, 'এবং ইব্রাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)–কে আমার গৃহ পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম; তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১২৫)।
পবিত্রতা নবী–রাসুলদের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কোরআনে তাঁদের পরিচয় বিবৃত হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তারা এমন লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়।' (সুরা-৭

আরাফ, আয়াত: ৮২; সুরা-২৭ নমল, আয়াত: ৫৬)। অজুর ফজিলত সম্পর্কে হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ভালোভাবে অজু করল, অতঃপর কালিমা শাহাদত পড়ল; তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খোলা থাকবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে।' (মুসলিম: ২৩৪, আবুদাউদ: ১৬৯, নাসায়ি: ১৪৮, তিরমিজি: ৫৫, ইবনে মাজাহ: ৪৭০, মুসনাদে আহমাদ: ১২২)।

যে কারেণ মানবজাতির আত্মার পবিত্রতা জরুরি

প্রাণঘাতী মহামারি করোনায় সবার মাঝেই এক অজানা শঙ্কা দেখা দিয়েছে। দিন দিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এ সংক্রমণে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে মৃত্যুর সংখ্যা। এ মহামারি থেকে আত্মরক্ষায় প্রথমেই প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি অর্জন তথা আত্মার পবিত্রতা।

প্রাণঘাতী মহামারি করনোর প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে আমাদের নিয়ম-নীতি মেনে চলা যেমন আবশ্যক তেমনি আমাদের হৃদয়কেও করতে হবে স্বচ্ছ এবং পবিত্র। কেননা আল্লাহ তাআলা চান তার বান্দারা যেন স্বচ্ছ পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হয়।
মানুষের মুখের কথাগুলো যেন হয় সহজ-সরল। সে যেন পরস্পরের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর কথা বলে। মুখে যা বলে অন্তরেও যেন তা থাকে। মুখে এক আর অন্তরে আরেক এমন লোকদের তিনি মোটেও ভালবাসেন না। এমনকি আমাদের অন্তরে কী আছে তাও তিনি খুব ভালভাবে জানেন।

মানুষকে সহজেই নানান কৌশলে ধোঁকা দেয়া কিংবা বোকা বানানো সহজ কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলাকে কোনোভাবেই ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়। কারণ তিনি সেই মহান সত্ত্বা যিনি মানুষের প্রকাশ্য-গোপন ও ভেতর-বাহিরের সব কিছু সম্পর্কেই অবগত।

প্রকাশ্যে আর গোপনে কত পাপই না করে চলেছি আমরা। সব পাপের জন্যই প্রত্যেকের উচিত ক্ষমা চেয়ে হৃদয়কে পবিত্র করে নেয়া। আল্লাহ তাআলা কখনো তার সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করার পাপকে ক্ষমা করেন না।

এছাড়া তিনি অন্যান্য পাপ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন
নিঃসন্দেহে আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন তার প্রতি অপবাদ আরোপ করল।' (সুরা নিসা : আয়াত ৪৮)
আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তর এবং নিয়ত দেখে থাকেন। আমরা ভাল কাজ যতই করি না কেন হৃদয় যদি স্বচ্ছ না হয় এবং অন্তর যদি পবিত্র না হয় তাহলে এসব ভালো কাজ কোনো কাজেই লাগবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন-

'বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও দেখতে পাবে। ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দুরের হতো! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।' (সুরা ইমরান : আয়াত ২৯-৩০)

এ কারণেই মানুষের উচিত তার আত্মাকে পবিত্র করা। আত্মা পবিত্র করতে দিনের নির্ধারিত পাঁচ সময়ে নামাজ আদায় করা। ইবাদত-বন্দেগিতে নিজেকে নিয়োজিত করা। অশ্লীয় ও বেহায়াপনা কাজ ছেড়ে দেয়া।

বর্তমান মহামারি পরিস্থিতিতে সেবামূলক কাজ করা, সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ করেও আমরা আত্মাকে পবিত্র করে নিতে পারি। আর হৃদয়ের পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাতে। আল্লাহ তাআলা বলেন-
'তুমি কি তাদেকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে অথচ পবিত্র করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই? বস্তুতঃতাদের উপর সুতা পরিমাণ অন্যায়ও হবে না।' (সুরা নিসা : আয়াত ৪৯)

সুতরাং বিভিন্ন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার জন্য আমরা যদি পবিত্র হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে প্রার্থনা করি তাহলে হয়তো তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন। হাদিসে এসেছে-

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে আমি ঠিক তেমন ধারণা করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি ও তার সাথে থাকি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তা হলে আমি তাকে এর চেয়েও উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি।' (বুখারি, মুসলিম)

মনে রাখতে হবেআমাদের হৃদয়কে পবিত্র করতে হলে বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করা জরুরি। আল্লাহর জিকিরে সময় অতিবাহিত করা। আল্লাহর জিকির ও ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যম পরিশুদ্ধ আত্মা গঠনের মাধ্যমেই দুনিয়ার যাবতীয় মহামারি, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবে মুমিন মুসলমান।

কেননা আল্লাহর জিকিরে মাধ্যমেই তার সান্নিধ্য লাভ করার উপায়। তাই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও আত্মাকে পবিত্র করতে কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের অধ্যয়নের বিকল্প নেই। কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার অধ্যয়ন মানুষের হৃদয়কে পবিত্র করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করার তাওফিক দান করুন। তিনি সবাইকে ক্ষমা করুন এবং রহমতের চাদরে ঢেকে রাখুন। মহামারি করোনাসহ যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

স্বীয় নাফসের সাথে মুসলিম বান্দার আদবসমূহ

মুসলিম ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের সফলতা নির্ভর করে তার 'নাফস' তথা স্বীয় মনকে সংশোধন, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার পরিধির উপর;

যেমনিভাবে তার জীবনের ব্যর্থতা নিশ্চিত হয় তার মনের ভ্রষ্টতা, নিষ্ক্রিয়তা, কলুষতা, অবিত্রতা ও অশুদ্ধতার কারণে; আর এর পিছনে দলীল বা যুক্তিগুলো নিম্নরূপ:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

“সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।”[1] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبۡوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلۡجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلۡخِيَاطِۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٤٠ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٞ وَمِن فَوۡقِهِمۡ غَوَاشٖۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ ٤١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٤٢ ﴾ [الاعراف :٤٠، ٤٢]

“নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তা সম্বন্ধে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না- যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আর এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব। তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও; আর এভাবেই আমরা যালিমদেরকে প্রতিফল দেব। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে- আমরা কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দেই না- তারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।”[2] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣ ﴾ [العصر :١، ٣]

“সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মাঝে নিপতিত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে হকের এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যের।”[3] আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أَبَى . قَالُوا : وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُول الله ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى » . (رواه البخاري)

“আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে, সে ব্যতীত; তারা প্রশ্ন করল: হে আল্লাহ রাসূল! কে অস্বীকার করবে? জবাবে তিনি বললেন: যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যে আমার অবাধ্য হবে, সেই মূলত অস্বীকারকারী।”[4] তিনি আরও বলেন:

« كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا » . (رواه مسلم)

“প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে নিজেকে বিক্রি করে দেয়; তারপর সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।”[5]

অনুরূপভাবে মুসলিম ব্যক্তি এটাও বিশ্বাস করে যে, যার উপর ভিত্তি করে আত্মা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হবে, তা হলো ঈমানের সৌন্দর্য ও সৎকাজ; আর যার কারণে আত্মা কলুষিত, অপবিত্র ও ধ্বংস হবে, তা হলো কুফরী ও অবাধ্যতার মত খারাপ কাজ; আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ

“আর আপনি সালাত কায়েম করুন দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। নিশ্চয় সৎকাজ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়।”[6] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

بَلۡۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

“বরং তারা যা অর্জন করেছে, তা-ই তাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরিয়েছে।”[7] আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذنباً كَانَ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْتَبَ ، صُقِلَ قَلْبُهُ ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلَقَ قَلْبَهُ » .(رواه النسائي و الترمذي و أحمد)

“নিশ্চয় মুমিন বান্দা যখন একটি গুনাহ করে, তখন তার অন্তরের মধ্যে তা একটি কালো দাগ সৃষ্টি করে; তারপর যদি সে তাওবা করে, গুনাহ থেকে দূরে থাকে এবং অনুতপ্ত হয়, তাহলে তার অন্তরকে চকচকে পরিষ্কার করে দেয়া হয়; আর যদি গুনাহর সংখ্যা বাড়তে থাকে, তাহলে (অন্তরের মধ্যে) কালো দাগের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তা তার অন্তরকে ঢেকে ফেলবে।”[8] আর এটাই হলো অন্তরে মরিচা বা জঙ্ ধরা, যা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

كَلَّاۖ بَلۡۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

“কখনো নয়; বরং তারা যা অর্জন করেছে তা-ই তাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরিয়েছে।”[9] তিনি আরও বলেন:

« اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » . (رواه أحمد و الترمذي و الحاكم).

“তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর; আর অসৎকাজ করলে তার পরপরই সৎকাজ কর, তাহলে তা মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে; আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর।”[10]এ জন্য মুসলিম ব্যক্তি সার্বক্ষণিক কাজ করবে তার ‘নাফস’ তথা আত্মার সংশোধন, পরিশুদ্ধকরণ ও পবিত্রকরণে জন্য; কারণ, ঐ ব্যক্তির আত্মাই উত্তম, যে

আদব রক্ষা করে চলে; সুতরাং সে তার নাফসের জন্য এমন কতগুলো আদব রক্ষা করবে, যা তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তার ময়লাসমূহকে দূর করে তাকে পবিত্র করবে; অনুরূপভাবে তাকে দূরে রাখবে খারাপ আকিদা-বিশ্বাস এবং মন্দ কথা ও কাজের মত এমন সব বিষয় থেকে, যা তাকে কলুষিত ও নষ্ট করে দেয়; আর সে তার উন্নতির জন্য রাতদিন চেষ্টা-সাধনা করবে এবং প্রতি মুহূর্তে আত্মসমালোচনা করবে; সে তাকে ভালোকাজে পরিচালিত করবে এবং তাকে (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) আনুগত্য করতে বাধ্য করবে; ঠিক অনুরূপভাবে সে তাকে দূরে রাখবে যাতীয় খারাপ ও মন্দ থেকে; আর তাকে সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহের অনুসরণ করবে:

তওবাহ্

তাওবার উদ্দেশ্য হলো সকল প্রকার অপরাধ ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা, পূর্বের কৃত প্রত্যেকটি গুনাহ'র জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যৎ জীবনে পুনরায় সেসব গুনাহ না করার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর এটা এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ﴾ [التحريم :٨]

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর- বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।"[1] তিনি আরও বলেন:

وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"আর তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[2] আর আল্লাহ তা'আলা শু'আইব আ. এর বক্তব্য বর্ণনা করে বলেন:

وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٞ وَدُودٞ

"আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে আস; আমার রব তো পরম দয়ালু, অতি স্নেণহময় ।"[3] আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ». (رواه مسلم)

“হে মানবগোষ্ঠী! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর; কারণ, আমি তাঁর কাছে দিনে একশত বার তাওবা করি।”[4] তিনি আরও বলেন:

.مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ « .)رواه مسلم(»

“যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে তাওবা করবে, তার তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন।”[5] তিনি আরও বলেন:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ » .اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا « .)رواه مسلم (

“আল্লাহ তা‘আলা পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (কিয়ামত পর্যন্ত) প্রত্যেক রাতে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করবেন, যাতে দিনের গুনাহগার তাওবা করে। আবার তিনি দিনের বেলায় ক্ষমার হাত প্রসারিত করবেন, যাতে রাতের গুনাহগার তাওবা করে।”[6] তিনি আরও বলেন:

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِى أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ، ثُمَّ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِى الَّذِى كُنْتُ فِيهِ ، فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ .وَزَادِهِ « .)رواه مسلم (

“আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মুমিন বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি খাদ্য ও পানীয় নিয়ে তার বাহন তথা উটসহ মরুভুমিতে অবস্থান করে, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর জেগে উঠে দেখে সেই উটটি চলে গেছে; অতঃপর সে তাকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে যায়; অতঃপর সে বলে: আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে ফিরে যাব, অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকব। অতঃপর সে মরে যাওয়ার জন্য তার বাহুর উপর মাথা রাখল; অতঃপর সে জেগে উঠে দেখল, তার নিকটেই খাদ্য ও পানীয়সহ তার উটটি অবস্থান করছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি তার উট ও রসদপত্র ফিরে পেয়ে যেমন আনন্দিত হল, আল্লাহ তা‘আলা মুমিন বান্দার তাওবায় তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দিত হন।”[7] আরও বর্ণিত আছে যে, ফেরেশ্তাগণ আদম আ. কে তাঁর তাওবার কারণে অভিনন্দন জানিয়েছে, যখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর তাওবা কবুল করেছেন।[8] তিনি আরও বলেন:

يَضْحَكُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يقْتلُ أَحَدهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي » .سَبيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يتُوبُ اللهُ عَلَى القَاتلِ فَيُسْلِم فَيُسْتَشْهَدُ « .)رواه البخاري(

“আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এমন দুই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে হাসবেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একজন

আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হবে। তারপর আল্লাহ হত্যাকারীর তাওবা কবুল করবেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে (জিহাদে) শহীদ হয়ে যাবে।”[9] আরও বর্ণিত আছে যে, ফেরেশ্তাগণ আদম আ. কে তাঁর তাওবার কারণে অভিনন্দন জানিয়েছে, যখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর তাওবা কবুল করেছেন।[10]

মুরাকাবা

আর ‘মুরাকাবা’ হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক তার ‘নাফস’কে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা’র পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাওয়া এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাকে সেভাবে নিয়োজিত রাখা, এমনকি তার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা অর্জিত হওয়া এমনভাবে যে, আল্লাহ তা‘আলা তার ব্যাপারে পূর্ণ অবগত, তিনি তার গোপন বিষয়সমূহ জানেন, তার কর্মকাণ্ডসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন, তাকে তত্ত্বাবধান করেন এবং প্রত্যেকটি ‘নাফস’ যা অর্জন করে তিনি তা নিবিড়ভাবে দেখাশুনা করেন; আর এর দ্বারা তার আত্মা পুরাপুরিভাবে আল্লাহ তা‘আলার পর্যবেক্ষণের আওতায় চলে যাবে, তাঁর স্মরণে সে আনন্দ অনুভব করবে, তাঁর আনুগত্য করতে মজা পাবে, তাঁর সান্নিধ্য পেতে উৎসাহিতবোধ করবে, তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে এবং তিনি ভিন্ন অন্যকে পরিহার করবে

আর এটাই হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণীতে উল্লেখিত নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করার অর্থ; তিনি বলেন:

وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينٗا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ

তার চেয়ে দ্বীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে।”[1] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ

“আর যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে নিজেকে আল্লাহ কাছে সমর্পণ করে, সে তো দৃঢ়ভাবে ধরলো এক মজবুত হাতল।”[2] আর এটাই হলো ‘মুরাকাবা’-এর আসল বিষয়, যে দিকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বাণীর মধ্যে আহ্বান করেছেন, তিনি বলেন:

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ

“আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় কর।”[3] তিনি আরও বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।”[4] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأۡنٖ وَمَا تَتۡلُواْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلَا تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إِذۡ تُفِيضُونَ فِيهِۚ ﴾ [يونس: ٦١]

“আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে আমলই কর না কেন, আমরা তোমাদের সাক্ষী থাকি-- যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও।”[5] আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ » . (متفق عليه).

“তুমি আল্লাহ তা‘আলার ‘ইবাদত করবে এমনভাবে, মনে হয় যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে মনে রাখবে তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।”[6]

আর এটা এমন এক বিষয়, যাতে অভ্যস্ত হয়েছেন এ উম্মতের প্রথম দিকের সৎকর্মশীল বিশেষ ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা এ বিষয়টিকে নিজেদের জীবনের ব্রত (লক্ষ্য) হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এমনকি তাঁদের পূর্ণ একীন বা আস্থা অর্জিত হয়েছে এবং তাঁরা আল্লহর নিকটতম বান্দাদের মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন; আর এখানে তাঁদের কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো, যা তাঁদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে:

১. জুনাইদ রহ. কে জিজ্ঞাস করা হলো: দৃষ্টিকে অবনমিত রাখার জন্য কিসের সাহায্য নেয়া যেতে পারে? জবাবে তিনি বললেন: তোমার এ জ্ঞান দ্বারাই তা সম্ভব হবে যে, কোনো বস্তুর দিকে তোমার নজর যওয়ার চেয়ে তোমার দিকে দর্শক আল্লাহর নজর বা দৃষ্টি অনেক বেশি দ্রুতগামী।[7]

২. সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন: তোমার উচিৎ হবে এমন সত্তাকে ভয় করা, যাঁর কাছে তোমার কোনো কিছুই গোপন থাকে না; তোমার কর্তব্য হলো এমন সত্তার নিকট কোনো কিছুর আশা করা, যিনি তা পুরণ করার ক্ষমতা রাখেন এবং তোমার উচিৎ হবে এমন এক সত্তার ব্যাপারে সাবধান হওয়া, যিনি শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন।[8]

৩. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে অমুক! তুমি আল্লাহকে ভয় কর; তখন লোকটি তাঁকে ‘মুরাকাবা’ তথা আল্লার ভয় সম্পকে

জিজ্ঞাসা করলেন; জবাবে তিনি তাকে বললেন: তুমি সব সময় এমনভাবে জীবনযাপন করবে, মনে হয় যেন তুমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাচ্ছো।[9]

৪. আবদুল্লাহ ইবন দিনার বলেন: আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং পথিমধ্যে আমরা বিশ্রামের জন্য অবস্থান করলাম, অতঃপর পাহাড় থেকে এক রাখাল আমাদের নিকট নেমে আসল; অতঃপর ওমর রা. তাকে লক্ষ্য করে বললেন: হে রাখাল! এ ছাগলের পাল থেকে একটি ছাগল আমাদের কাছে বিক্রি কর; তখন রাখাল বলল যে, সে গোলাম মাত্র (ছাগলের মালিক নয়); তারপর ওমর রা. তাকে বলল: তুমি তোমার মালিককে বলবে ছাগলটি বাঘে খেয়েছে; তখন গোলাম বলল: আল্লাহ কোথায় থাকবেন? এ কথা শুনে ওমর রা. কেঁদে ফেললেন এবং পরের দিন রাখালটির মালিকের নিকট গেলেন এবং তার কাছ থেকে তাকে (গোলামটিকে) ক্রয় করে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।[10]

৫. কোনো এক সৎব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদল লোকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেন, যারা মল্লযুদ্ধ বা তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত, আর একজন তাদের থেকে দূরে বসে তা উপভোগ করছে; তারপর তিনি তার সাথে কথা বলার উদ্দেশ্যে তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে বললেন: আমি (তোমার কাছে) আল্লাহর স্মরণ প্রত্যাশা করি; তখন সে বলল: তুমি কি একা? জবাবে তিনি বললেন: আমার সাথে আমার রব এবং আমার দুই ফেরেশ্তা আছেন; এবার তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: এদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি সবচেয়ে অগ্রগামী? জবাবে সে বলল: যাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন; এবার সে তাকে জিজ্ঞাসা করল: রাস্তা কোথায়, অর্থাৎ কোথায় যাবেন? জবাবে তিনি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং হাঁটতে শুরু করলেন।[11]

৬. বর্ণিত আছে যে, যুলায়খা যখন ইউসূফ আ. কে নির্জনে একাকী পেল, তখন দাঁড়িয়ে গেল এবং তার (ঘরে সংরক্ষিত) মূর্তির চেহারা ঢেকে দিল; তারপর ইউসূফ আ. বললেন: তোমার কী হয়েছে? তুমি কি একটি নিষ্প্রাণ জড়পদার্থের দেখে ফেলবে বলে লজ্জা পাচ্ছো? তাহলে আমি কি মহাপরাক্রমশালী বাদশার পর্যবেক্ষণ বা পরিদর্শনকে লজ্জা পাবো না? [12]

আবার কেউ কেই আবৃত্তি করেন:

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ :عَلَيَّ رَقِيبُ

(যখনই তুমি একদিন সময় অতিবাহিত করবে, তখন তুমি বলবে না

আমি সময় অতিবাহিত করে ফেললাম, বরং তুমি বল: আমার উপর রয়েছেন এক পর্যবেক্ষ- প্রহরী)।

وَ لا تَحْسَبَنَّ اللهَ يَغْفَلُ سَاعَةً وَ لا أَنَّ مَا تُخْفي عَلَيْهِ يَغِيبُ

(আর তুমি আল্লাহকে এক মুহূর্তের জন্যও গাফেল বা অসতর্ক মনে করো না, আর তুমি তাঁর কাছ থেকে যা কিছুই গোপন করবে, তাঁর কাছে তা গোপনও থাকবে না)।

ألم تر أن اليومَ أسرعُ ذاهبٍ و أن غداً للناظرين قريبُ

(তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, আজকের দিনটি কত দ্রুত চলে যাচ্ছে,আর আগামী দিনটি দর্শকদের জন্য খুবই নিকটবর্তী) ? [13]

মুহাসাবা

আর 'মুহাসাবা' হলো যখন মুসলিম ব্যক্তি এ জীবনে রাতদিন এমনভাবে আমল করে, যা তাকে পরকালে সৌভাগ্যবান করবে, আখিরাতে সম্মান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে সম্ভব করে তুলবে এবং দুনিয়া হবে তার মৌসুম বা সময়কাল, তখন তার উচিত হলো তার উপর আবশ্যকীয় ফরয ও ওয়াজিব বিষয়গুলোর প্রতি এমনভাবে নজর দেওয়া, যেমনিভাবে একজন ব্যবসায়ী তার মূলধনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে; আর নফল বিষয়গুলোর প্রতি এমনভাবে নজর দেওয়া, যেমনিভাবে একজন ব্যবসায়ী মূলধনের উপর অতিরিক্ত লাভের দিকে দৃষ্টি রাখে; আর অবাধ্যতা ও অপরাধের দিকে দৃষ্টি রাখবে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার মত করে; অতঃপর প্রত্যেক দিনের শেষে নিরিবিলে নির্জনে একটি সময় করে তাতে তার সেদিনের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করবে; তারপর সে যদি দেখে ফরযসমূহ পালনে কোনো ঘাটতি বা ত্রুটি হয়েছে, তাহলে সে স্বীয় নাফসকে তিরস্কার করবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করার জন্য পদক্ষেপ নেবে। সুতরাং তা যদি কাযা আদায় করার মত কোনো বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে কাযা করে নেবে; আর কাযা আদায় করার মত বিষয় না হলে বেশি করে নফল আদায় করার মাধ্যমে তার ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করবে; আর যদি সে নফলের ব্যাপারে ঘাটতি দেখে, তাহলে ঘাটতি পূরণ করে নেবে এবং তা সংশোধন করবে। আর যদি সে নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হওয়ার কারণে

কোনো ক্ষতির বিষয় লক্ষ্য করে, তাহলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, অনুতপ্ত হবে, তাওবা করবে এবং এমন ভালো কাজ করবে, যাকে সে তার অন্যায়ের পরিপূরক মনে করবে।

আর এটাই হলো 'মুহাসাবা' তথা আত্মসমালোচনার মূল উদ্দেশ্য; আর আত্মসমালোচনা হলো 'নাফস' তথা আত্মাকে সংস্কার, সংশোধন, পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার অন্যতম একটি পদ্ধতি; আর তার কিছু দলীল ও দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"[1] সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ -এর মধ্যে ব্যক্তিকে প্রতিক্ষিত আগামী দিন তথা পরকালোর জন্য কী আমল করা হয়েছে, সে বিষয়ে আত্মসমালোচনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[2]

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِى وَإِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ » . (رواه مسلم).

"(কখনও কখনও) আমার অন্তরের উপর পর্দা ফেলা হয়; আর আমি দৈনিক একশতবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

৪. ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

« حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا » .

"তোমরা হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার পূর্বেই তোমাদের নিজেদের হিসাব নিজেরা নিয়ে নাও।"[4] আর যখন রাতের আগমন ঘটত, তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু দোর্রা বা লাঠি দিয়ে তাঁর দু'পায়ে পিটাতেন এবং নিজেকে প্রশ্ন করে বলতেন: তুমি আজকে কী কাজ করেছ?[5]

৫. আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে যখন তাঁর বাগান তাঁর সালাত আদায় করার বিষয়টিকে ভুলিয়ে রাখল, তখন তিনি বাগানের অংশবিশেষ আল্লাহ তা'আলার

উদ্দেশ্যে সাদকা করে দিলেন; সুতরাং তিনি এ কাজটি করেছিলেন শুধু তাঁর আত্মসমালোচনার কারণেই এবং নিজকে তিরস্কার স্বরূপ ও আত্ম-সংশোধনের জন্য।[6]

৬. আহনাফ ইবন কায়েস সম্পর্কে বর্ণিত আছে: তিনি চেরাগের নিকট আসতেন, তারপর তিনি তাঁর আঙুল চেরাগের মধ্যে ধরে রাখতেন ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না তিনি আগুনের উত্তাপ অনুভব করতেন; অতঃপর তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলতেন: হে হুনায়েফ! অমুক দিন তুমি যে কাজ করেছ, তা করতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে? অমুক দিন তুমি যে কাজ করেছ, তা করতে তোমাকে কিসে উত্তেজিত করেছে?[7]

৭. বর্ণিত আছে: জনৈক সৎব্যক্তি যোদ্ধা ছিলেন; এক মহিলা তার উদ্দেশ্যে নগ্ন হয়ে গেল; তারপর তিনি তার দিকে তাকালেন; অতঃপর তিনি তাঁর হাত উঠায়ে তাঁর চোখে থাপ্পর মারলেন এবং তাঁর চোখ উপড়িয়ে ফেললেন; আর বললেন: নিশ্চয়ই তুমি তা দেখতে পাচ্ছ, সে যে ক্ষতি তোমার করেছে![8]

৮. কোনো এক ভালো মানুষ একটি কক্ষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি বললেন: এ কক্ষটি কখন বানানো হয়েছে? অতঃপর তিনি আত্মসমালোচনায় মনোযোগ দিলেন এবং বললেন: তুমি আমাকে এমন এক প্রশ্ন করলে, যা তোমার কোনো প্রয়োজন ছিল না; আমি তোমাকে শাস্তি দিব এক বছর সাওম পালন করার মাধ্যমে, তারপর তিনি এক বছর সাওম পালন করলেন।[9]

৯. আরও বর্ণিত আছে: কোনো এক সৎ মানুষ উত্তপ্ত ভূমির দিকে গেলেন, অতঃপর তিনি তাতে গড়াগড়ি দিতে থাকলেন এবং নিজেকে নিজে বলতে লাগলেন: মজা ভোগ কর, জাহান্নামের আগুন আরও অনেক বেশি উত্তপ্ত; তুমি কি রাতের বেলায় নোংরা বা পঙ্কিল এবং দিনের বেলায় বীর?[10]

১০. আরও বর্ণিত আছে: সৎ ব্যক্তিগণের কোনো একজন একদিন ছাদের দিকে তাঁর মাথা উঠালেন এবং এক নারীকে দেখলেন; তারপর তিনি তার দিকে তাকালেন; অতঃপর তিনি নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি যতদিন জীবনে বেঁচে থাকবেন কোনো দিন আকাশের দিকে তাকাবেন না।[11]

এভাবেই এ উম্মতের সৎকর্মশীল বান্দাগণ নিজেদের অবহেলার ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করতেন, ভুলত্রুটির জন্য নিজেকে নিজে তিরস্কার করতেন, নিজের

‘নাফস’-এর জন্য তাকওয়ার বিষয়টিকে অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য বিষয় বলে ধারণ করতেন এবং তাকে নিজের খেয়াল-খুশি মত চলা থেকে বিরত রাখতেন। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেন:
وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ “আর যে তার রবের অবস্থানকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে; জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।”[12]

মুজাহাদা

আর ‘মুজাহাদা’ হলো মুসলিম ব্যক্তি জেনে রাখবে যে, তার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তার ‘নাফস’, যা স্বভাবতই খারাপ কাজের প্রতি আকৃষ্ট, ভালো কাজ থেকে পলায়নমান এবং মন্দ কাজের উস্কানিদাতা বা নির্দেশদাতা; আল্লাহ তা‘আলা বলেন:
وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ
“আর আমি নিজকে নির্দোষ মনে করিনা, কেননা, নিশ্চয় মানুষের নাফস খারাপ কাজের নির্দেশ দিয়েই থাকে।”[1] আর এ ‘নাফস’ পছন্দ করে শান্তিতে ও স্থায়ীভাবে আরামে থাকেতে, ভালোবাসে অবসর সময় কাটাতে এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে সমূলে তাৎক্ষণিক বা নগদ ভোগবিলাসে আকৃষ্ট করতে, যদিও তাতে তার মরণ ও দুর্ভাগ্য বা দুঃখ-কষ্টের বিষয়টি নিহিত রয়েছে।
সুতরাং মুসলিম ব্যক্তি যখন এ বিষয়টি বুঝতে পারবে, তখন সে নিজেকে প্রস্তুত করবে তার ‘নাফস’কে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা ও সাধনা করার জন্য; ফলে সে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, অস্ত্রধারণ করবে তার বিপক্ষে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তার বুদ্ধিহীনতা বা অস্থিরচিত্ততা এবং লোভ লালসাসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। ফলে তার ‘নাফস’ যখন শান্তি পছন্দ করবে, তখন সে তাকে তার সুযোগ করে দিবে। আর যখন লোভ লালসার প্রতি আগ্রহী হবে, তখন সে তার জন্য তা হারাম করে দিবে; আর যখন কোনো আনুগত্য বা ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে ত্রুটি করবে বা বিরত থাকবে, তখন তাকে শাস্তি দিবে এবং তিরস্কার করবে, তারপর যে (ভালো) কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা করতে তাকে বাধ্য করবে এবং যা কাজা বা বর্জন করেছে, তার কাযা আদায় করতে বাধ্য করবে। সে তার জন্য এ পদ্ধতি

অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তার মন প্রশান্তি লাভ করবে ও পবিত্রতা অনুভব করবে; আর এটাই স্বীয় 'নাফস'-এর জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা ও সাধনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

"আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের হিদায়াত দিব। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের সঙ্গে আছেন।"[2]

আর মুসলিম ব্যক্তি যখন আল্লাহর জন্য তার 'নাফস'কে প্রস্তুত করবে, যাতে তা পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও প্রশান্ত হয় এবং হয় আল্লাহ তা'আলার করুণা ও সন্তুষ্টির অধিকারী, তখন সে বুঝতে পারবে যে, এটাই হলো সৎকর্মশীল ও সত্যিকার মুমিনগণের পথ; ফলে সে তাদের অনুসরণ করে পথ চলবে এবং পরিভ্রমণ করবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত জেগে নফল সালাত আদায় করতেন, এমনকি তাতে তাঁর দুই কদম মুবারক ফুলে পেটে যেত এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন:

« أَفَلا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً » . (مُتَّفَقٌ عَلَيهِ).

"আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়াটাকে পছন্দ করব না?"[3] আর আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

« والله ، لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى شيئا يشبههم كانوا يصبحون شعثاً غبراً صُفراً قد باتوا لله سجداً وقياماً ، يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم و جباههم ، و كانوا إذا ذُكر الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح ، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم

আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহাবীগণকে দেখেছি এবং আমি তাঁদের মত কোনো সৃষ্টিকে দেখিনি— তাঁদের সকাল হতো আউলা কেশে ধূলা মাখানো বেশে ফ্যকাশে চেহারায়, তাঁরা রাতযাপন করেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায়; তাঁরা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতেন পালাক্রমে তাঁদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ও কপাল মাটিতে রেখে সিজদারত অবস্থায়; আর তাঁদের যখন আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, তখন তাঁরা এমনভাবে আন্দোলিত হয়, যেমনিভাবে ঝড়ের দিনে গাছপালা আন্দোলিত হয় এবং তাঁদের চোখের অশ্রুতে ভেসে তাঁদের কাপড়সমূহ ভিজে যেত।"[4]

আর আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: “যদি তিনটি জিনিস না থাকত, তাহলে আমি একদিনও বেঁচে থাকাটাকে পছন্দ করতাম না: ১. প্রচণ্ড তাপের সময় আল্লাহর জন্য তৃষ্ণার্ত থাকা (অর্থাৎ সাওম পালন করা), ২. মধ্য রাতে আল্লাহকে সিজদা করা, এবং ৩. এমন সম্প্রদায়ের সাথে উঠা-বসা করা, যারা এমনভাবে বাছাই করে ভালো ভালো কথা বলে, যেমনিভাবে (খাওয়ার সময়) ভালো ভালো ফলগুলো বাছাই করা হয়।”[5]

আর ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জামায়াতে আসরের সালাত আদায় করতে না পারার কারণে নিজেকে নিজে তিরস্কার করেন এবং এ কারণে তিনি দুই লক্ষ দিরহাম মূল্যের জমি সাদকা করে দেন।[6]

আর আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা যখন কোনো সালাত জামায়াতে আদায় করতে ব্যর্থ হতেন, তখন তিনি ঐ রাতের পুরোটাই জেগে থাকতেন এবং পরের দিন মাগরিবের সালাত আদায় করা পর্যন্ত দিনের বেলায়ও ঘুমাতেন না, এমনকি রাতের আকাশে তারা উদয় হওয়ার পর তিনি দু’টি গোলাম আযাদ করে দিতেন।[7] আর আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন:

« رحم الله أقواما يحسبهم الناس مرضى ، وما هم بمرضى »

“আল্লাহ ঐসব সম্প্রদায়ের প্রতি রহম করুন, জনগণ যাদেরকে অসুস্থ মনে করে, অথচ তারা অসুস্থ নন।”[8] আর এগুলো হলো স্বীয় নাফসের উন্নয়নে কঠোর সাধনার কিছু নমুনা।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« خَيرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرهُ ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ » . (رواه الترمذي).

“সেই ব্যক্তি উত্তম, যার বয়স দীর্ঘকাল ব্যাপী এবং কাজ সুন্দর।”[9] আর উয়াইস আল-কারনী রহ. বলতেন:

« هذه ليلة الركوع فيحيى الليل كله في ركعة ، وإذا كانت الليلة الآتية قال : هذه ليلة السجود فيحيى الليل كله في سجدة » .

“এটা হলো রুকূ‘ করার রাত, ফলে তিনি এক রুকূ‘তে গোটা রাত কাটিয়ে দিতেন; আর যখন পরবর্তী রাত আসত, তখন তিনি বলতেন: এটা হলো সিজদা করার রাত, ফলে তিনি এক সিজদাতেই গোটা রাত কাটিয়ে দিতেন।”[10]

আর সাবিত আল-বানানী রহ. বলেন: আমি এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে পেয়েছি, যাদের একজন সালাত আদায় করতেন, অথচ তিনি হামাগুড়ি দেয়া ছাড়া তাঁর নিজ বিছানায় আসতে পারতেন না। আবার তাদের একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন, এমনকি দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তার দুই পা ফুলে যেত এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তার চেষ্টা-সাধনা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, যদি তাকে বলা হত: আগামী কাল কিয়ামত, তবুও তিনি অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার চিন্তা করতেন না। আবার তাদের কেউ কেউ যখন শীতকাল আসত, তখন তিনি ঘরের ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতেন, যাতে ঠাণ্ডা বাতাসের আঘাতে তার ঘুম না আসে; আবার যখন গরমকাল আসত, তখন তিনি ঘরের ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতেন, যাতে গরমের কারণে তার ঘুম না আসে। আবার কেউ কেউ সিজদারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতেন।[11]

আর মসরূক রহ. এর স্ত্রী বলেন: "সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে মাসরূক রহ.কে তাঁর দুই পা ফুলা অবস্থায় দেখা যেত; আল্লাহর কসম! আমি যদি তাঁর সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁর পেছনে বসতাম, তাহলে তাঁর প্রতি সহমর্মিতার কারণে আমি কেঁদে ফেলতাম।"[12]

আর তাদের কারো বয়স যখন চল্লিশে উপনিত হত, তখন তিনি তার বিছানা গুটিয়ে ফেলতেন, তারপর তিনি তার উপর আর কখনও ঘুমাতেন না।[13]

আরও বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী সৎব্যক্তিগণের মধ্য থেকে কোনো এক পবিত্রা নারী, যাকে অক্ষম দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলা হত, তিনি যখন রাতের শেষ ভাগে উপনীত হতেন, তখন তিনি করুণ স্বরে ডাকতেন:

« إليك قطع العابدون دجى الليالى يستبقون إلى رحمتك ، وفضل مغفرتك ، فبك يا إلهى أسألك لا بغيرك أن تجعلنى في أول زمرة السابقين ، وأن ترفعنى لديك في عليين ، في درجة المقربين ، وان تلحقنى بعبادك الصالحين ، فأنت أرحم الرحماء ، وأعظم العظماء ، وأكرم الكرماء ، يا كريم ! » .

"হে আমার প্রভু! রাতের অন্ধকারে বান্দাগণ সবকিছু বয়কট করে তোমার দিকে আসে, তারা তোমার রহমত ও ক্ষমার দিকে দৌড়ায়; আতএব, হে আমার আল্লাহ! আমি তুমি ভিন্ন অন্য কারও কাছে নয়, শুধু তোমার কাছে আবেদন করছি যে, তুমি আমাকে অগ্রগামীদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত করে নাও, আমাকে তোমার নিকট-'ইল্লীনে উঠায়ে নাও, আমাকে তোমার নিকটতম বান্দাগণের মর্যাদায় উন্নীত কর এবং

আমাকে তোমার সৎ বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর; কেননা, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান, মহামহীয়ান, সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল, হে মহনুভব!।"[14] অতঃপর সে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং ফযর পর্যন্ত দো'য়া ও ক্রন্দন করতে থাকে।[15]

মন্দ কাজ থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখার উপায়

মানব মন পাপপ্রবণ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, '...মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্মপ্রবণ। কিন্তু সে নয়, তার প্রতি আমার রব দয়া করেন।' (সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ৫৩) কিন্তু মন্দ কাজে ধাবিত এই মনকে শাস্তি না দিলে সে আশকারা পেয়ে যায়। তাই মনের মুহাসাবা বা আত্মপর্যালোচনা দরকার।

মুমিন যখন তার মনের হিসাব নেবে তখন দেখতে পাবে, মন কোনো না কোনো পাপ করেছে কিংবা ইবাদতমূলক কাজে শিথিলতা দেখিয়েছে। ফলে যা ছুটে গেছে তার প্রতিকারের জন্য মনকে শাস্তি দেওয়া তার কর্তব্য, যাতে ভবিষ্যতে এমনটা আর না ঘটে এবং মন কর্মতৎপর হয়।

মনকে কর্মতৎপর না রাখলে, হিসাব না নিলে এবং শাস্তি না দিলে মন সোজা থাকবে না। আশ্চর্য হলো, মানুষ কখনো কখনো চারিত্রিক দোষ কিংবা অন্য কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে নিজ পরিবারের সদস্য ও চাকর-বাকরদের শাস্তি দেয়, কিন্তু সে নিজে কোনো মন্দ কাজ করলে নিজেকে শাস্তি দেয় না। অথচ নিজেকে শাস্তি দেওয়াই উত্তম ও সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ।

কখনো কখনো শাস্তির নামে উপেক্ষা ও ছাড় দিতে দেখা যায়। তবে নিজেকে শাস্তি দানের মূল লক্ষ্য নিজের মনকে আল্লাহর অনুগত রাখা এবং আগে করা হয়নি এমন সব ভালো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা।

মনকে শাস্তি দানের পূর্বসূরিদের পদ্ধতি এমনই ছিল। এখানে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো—

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর একবার আসরের সালাতের জামাত ছুটে গিয়েছিল। সে জন্য নিজেকে শাস্তিস্বরূপ তিনি এক খণ্ড জমি দান করে দেন। যার মূল্য ছিল দুই লাখ দিরহাম! (উমদাতুল কারি : ১২/১৭৩)

ইবনে ওমর (রা.)-এর কোনো সালাতের জামাত ছুটে গেলে সেদিন তিনি পুরো রাত ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাতেন! (ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৪০৮)

একবার ওমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.)-এর মাগরিবের সালাত আদায়ে এতটুকু বিলম্ব হয়েছিল যে সন্ধ্যাকাশে দুটি তারা নজরে আসছিল। তাতেই তিনি দুজন গোলাম

আজাদ করে দিয়েছিলেন, যদিও মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত তখনো শেষ হয়নি! (ইবনে তায়মিয়া, শারহুল উমদাহ : ৪/২১০)
ইবনে আবি রবিআ (রহ.)-এর একবার ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ছুটে গিয়েছিল। সেই দুঃখে তিনি একটি গোলাম আজাদ করে দিয়েছিলেন। (ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৪০৮)

ইবনে আউন (রহ.)-কে তাঁর মা ডাক দিলে তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর কণ্ঠস্বর মায়ের কণ্ঠস্বর থেকে একটু উঁচু হয়ে গিয়েছিল। তাতেই তিনি দুজন গোলাম আজাদ করে দিয়েছিলেন! (হিলয়াতুল আওলিয়া : ৩/৩৯)
সুতরাং পূর্বসূরিরা নিজেকে শাস্তিদান বলতে মনকে নেক কাজে লাগানো এবং জিকির-আজকার ও দোয়া-অজিফায় মশগুল রাখা বুঝতেন। যেসব হাদিসে অল্প আমলে অনেক সওয়াবের উল্লেখ আছে সেগুলো নিয়ে গভীর অনুধাবন ও আমল করাও নফসকে শাস্তিদানে সহায়ক। আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (রাত জেগে সালাতে) ১০টি আয়াত পড়বে তার নাম গাফিল-অলসদের তালিকায় লেখা হবে না। আর যে (রাত জেগে সালাতে) ১০০ আয়াত পড়বে তার নাম 'কানিতুন' বা অনুগতদের তালিকায় লেখা হবে। আর যে (রাত জেগে সালাতে) এক হাজার আয়াত পড়বে তাকে 'মুকান্তারুন' বা প্রাচুর্যময়দের তালিকাভুক্ত করা হবে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ১৩৯৮)
কোনো মুসলমান এই হাদিস এবং এ ধরনের অন্য হাদিস মনোযোগসহ লক্ষ করলে তার জীবনের অনেক মুহূর্ত যে অহেতুক ব্যয় হয়ে গেছে এবং শুধুই নিজ দেহকে আরাম দেওয়ার জন্য যে কত সওয়াব থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে তা ভেবে সে অনুশোচনায় কাতর হয়ে পড়বে। এবং এ ধরনের অল্প আমল কিন্তু বেশি সওয়াবময় কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে তুলবে।
অতীতে মুসলিম মনীষীরা আল্লাহর পথে কী পরিমাণ সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন আজকের যুগে তাঁদের মতো সাধক মানুষের উদাহরণ মেলা ভার। আবু দারদা (রা.) বলেন, 'তিনটি জিনিস না থাকলে আমি এক দিনের জন্যও বেঁচে থাকতে পছন্দ করতাম না। এক. দুপুর রোদে আল্লাহর জন্য পিপাসিত হওয়া (আল্লাহর দ্বিন প্রচার ও জিহাদের উদ্দেশ্যে মরুভূমির উত্তাপ সহ্য করা এবং তৃষ্ণার্ত হওয়ার মজা)। দুই. মধ্যরাতে সিজদাবনত হওয়া (তাহাজ্জুদ সালাত আদায় ও তাতে কোরআন পড়ার মজা)। তিন.

সেসব লোকের সঙ্গে ওঠাবসার সুযোগ, যারা উৎকৃষ্ট ফল বেছে বেছে সংগ্রহের মতো ভালো ভালো কথা সংগ্রহ করে। (ইবনুল মুবারক, আজ-জুহদ,
তাবেঈ মাসরুক (রহ.)-এর স্ত্রী বলেন, মাসরুক এত দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করতেন যে দাঁড়িয়ে থাকার দরুন বেশির ভাগ সময় তাঁর পা দুটো ফুলে থাকত। আল্লাহর কসম! তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশত আমি অনেক সময় তাঁর পেছনে বসে কাঁদতাম। (ইবনুল মুবারক, আজ-জুহদ, পৃষ্ঠা-৯৫)
মহান আল্লাহ আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিন।

মন খারাপ কাজ করতে চাইলে কী করবেন?

অনেক সময় ইসলামি অনুশাসন মেনে চলতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা জাগে খারাপ কাজ করার। কিন্তু ইসলাম মানুষের কাছে যা চায়, তা-ই সঠিক। সেটিকে মানুষের বিবেকও সঠিক বলে মেনে নেয়। কিন্তু তবুও, কখনো কখনো সঠিক কাজটা করতে ইচ্ছা করে না। মন খারাপ কিছু একটা করতে চায়, মন বন্য প্রাণীর মতো হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। এ সময়টিতে কী করবেন?

যখন প্রচণ্ড খারাপ লাগে কিংবা খারাপ কাজ করতে ইচ্ছা করে ঠিক তখনই জাহান্নামের আগুনের কথা মনে করা এবং আল্লাহকে প্রচণ্ড ভয় করা জরুরি। এ কথা সবাই জানে যে, যদি মানুষ নিজেদের নফসের কথা শুনে তাহলে ভয়ঙ্কর শাস্তির সম্মুখীন হবে। আর এই শাস্তি কোনো মানুষই চায় না।
মানুষের মনে খারাপ কাজ করার এই লড়াই প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। বিশেষ করে এ প্রবণতা তাদের মাঝে বেশি দেখা যায়, যারা ইসলামকে সত্য জানা সত্ত্বেও, জান্নাত-জাহান্নামকে সত্য মনে করা সত্ত্বেও বিভিন্ন খারাপ অভ্যাসে জড়িয়ে পড়েছে। এখন এর সমাধান কী?
প্রথমত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস তুলে ধরা যেতে পার। যারে ফলে মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। হাদিসটি হলো-হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেন, তখন তিনি জিবরিল আলাইহিস সালামকে এই বলে জান্নাতের দিকে পাঠান যে, জান্নাত এবং

জান্নাতবাসীদের জন্য যা কিছু তাতে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, তা দেখে এসো। তিনি তা দেখে ফিরে এসে বললেন- আপনার পরাক্রমের শপথ! এই জান্নাতের কথা শুনতে পেলে কেউ তাতে প্রবেশ না করে ছাড়বে না। এরপর তাঁর আদেশে তা (জান্নাত) কষ্টকর ও অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টন করা হলো। তারপর বললেন, সেখানে যাও এবং তা ও তার অধিবাসীদের জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে এসো। তিনি গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তা কষ্টদায়ক, মসিবত ও অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার পরাক্রমের কসম! আমার আশংকা হচ্ছে যে, তাতে কেউ-ই প্রবেশ করবে না।(পক্ষান্তরে)আল্লাহ তাআলা বললেন, যাও জাহান্নাম এবং জাহান্নামবাসীদের জন্য আমি তাতে যা কিছু তৈরি করে রেখেছি, তা দেখে এসো। জিবরিল আলাইহিস সালাম তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, তার এক অংশ অপর অংশের উপর চড়াও হচ্ছে। তিনি ফিরে এসে বললেন, আপনার পরাক্রমের শপথ! আমার আশংকা যে, এতে কেউ প্রবেশ করবে না। এরপর আল্লাহর আদেশে তাকে (জাহান্নাম) মুগ্ধকর বস্তু দ্বারা পরিবষ্টন করে দেওয়া হলো। আল্লাহ বললেন, তুমি এখন গিয়ে তা দেখে এসো। তিনি গিয়ে দেখলেন যে, তাকে মুগ্ধকর বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে। তিনি ফিরে এসে বললেন, আপনার পরাক্রমের শপথ! এখন আমার আশংকা হচ্ছে যে, এতে প্রবেশ করা থেকে কেউ নাজাত পাবে না।’

হাদিসের আলোকে বুঝা যায়, নফস যদি খারাপ কিছু করতে চায়, এটা খুবই স্বাভাবিক। এখানেই মুমিন বান্দার পরীক্ষা। যখন আপনার মন আল্লাহর অবাধ্য হতে চায়, তখন আপনি কার কথা শুনেন? আল্লাহর কথা নাকি আপনার প্রবৃত্তির কথা?হ্যাঁ, তখন আল্লাহর কথা শোনা জরুরি। যদিও তা শুনতে মন না চায়। শুধু আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না। সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা বান্দার কাছে এটাই চান। আর তা হলো— তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ।মানুষকে অবশ্যই তাঁর হুকুম অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক তাঁর বিধান অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আল্লাহ জানেন মানুষ তার কামনা-বাসনার অনুবর্তী হতে চায়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন।আবার যেই শয়তান সবসময় মানুষকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে যায়, সেই শয়তানও আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের ভেতরের সকল কামনা আকাঙ্ক্ষা তাঁরই সৃষ্টি। এই সব কিছু সেই বড় পরিকল্পনার অংশ। আর তাহলো- মানুষকে পরীক্ষা করা। এ কারণেই মহান আল্লাহ তাআলা বলেন ঘোষণা করেছেন-الَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَکُمۡ اَیُّکُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا‘যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ

ও জীবন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- ‘আমলের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম?’ (সুরা মুলক: আয়াত ২)মন খারাপ কাজ করতে চাইলে মানুষ কার কথা মতো কাজ করে? যখন মানুষের মন খারাপ কিছু করতে চায়, তখন সে কার কথা অনুযায়ী কাজ করে? যখন শয়তান মানুষের মনে ওয়াসওয়াসা দেয়, তখন মানুষ কার কথা অনুযায়ী কাজ করে? বান্দা কি আল্লাহর কথা শোনে নাকি নিজের মনের কথা শোনে?এই সময়টিতে মানুষ যদি আল্লাহর আনুগত্য করে এবং বার বার আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে তাহলে একসময় ইসলাম পালন করা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যায়। মনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের প্রতি ভালবাসা তৈরি হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়েও তায়েফের লোকজন জেনা-ব্যভিচার ছাড়তে চায়নি, সুদ ছাড়তে চায়নি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ইসলামের বিধিবিধান মানতে চায়নি। এ ব্যাপারে তায়েফের অধিবাসীদের একদল প্রতিনিধি মদিনায় এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এ নিয়ে কয়েকদিন যাবত আলোচনা চালিয়ে যায়।দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ইসলাম তাদের অন্তরে প্রবেশ করে। ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি ভালবাসা তৈরি হয়। তাই, মন না চাইলেও আল্লাহর আনুগত্য করা জরুরি। আল্লাহর বিধান মানা ছাড়া কোনো পথ নেই। কেননা মুমিন বান্দার জন্য জাহান্নাম কখনো কোনো পছন্দ হতে পারে না।

শয়তান হয়তো মানুষকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে বলতে পারে- ‘তুমি তোমার মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পারবে না।’ কিন্তু এটা সত্য নয়। কেননা মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন-لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ‘আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে।’ (সুরা বাকারা: আয়াত ২৮৬)মানুষের নফসের বিরুদ্ধে জেতার সামর্থ্য দিয়েই আল্লাহ তাআলা তাকে সুষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহ মানুষকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সেই কাজ করার সামর্থ্য রাখে।মনে রাখতে হবেশয়তান মানুষের অন্তরে নেগেটিভ সব চিন্তা-ভাবনা ঢুকিয়ে তাকে হতাশ করে দিতে চায়। মানুষকে হতাশ করে দিলে তার কী লাভ? তার লাভ হলো- যদি মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে তাহলে আবার খারাপ অভ্যাসগুলোতে সহজেই জড়িয়ে পড়বে।

তাই মন খারাপ হলে-মনকে ভালো করে তোলা। আলস্য ছেড়ে দ্রুত উঠে পড়া। নামাজ আদায় করা বাকি থাকলে নামাজ আদায় করে নেওয়া। খারাপ কোনো কাজ করতে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তা থামিয়ে দেওয়া। তাহলেই পরকাল নিয়ে মানুষের মাঝে ইতিবাচক আশা তৈরি হবে। আর যখনই মানুষ পরকাল নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠবে, তখনই মানুষের অন্তরে খারাপকে মোকাবেলা করার শক্তি তৈরি হবে, ভালো কাজ করার উৎসাহ বেড়ে যাবে।

শয়তান মানুষের সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্তে আক্রমণ করে বসে। সেই দুর্বল মুহূর্তটি খুঁজে বের করা। সে সময়টি হতে পারে অফিস থেকে বাসায় ফেরার পর বা অন্য কোনো সময়। এই খারাপ মুহূর্তটি যখনই হোক; মন খারাপ হলে- সে সময় ভালো কিছু করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। বাইরে থেকে ঘুরে আসা। জোর করে কোনো ইসলঅমি আলোচনা শোনা। কোরআন তেলাওয়াত শোনা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী পড়া। আল্লাহর কাছে সুন্দর সুন্দর দোয়া করতে থাকা। বেশি বেশি জিকির করা। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। দোয়া পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়া। এতে শয়তান পরাজিত হবে। আল্লাহর রহমতে জিতে যাবে মুমিন বান্দা।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে মন খারাপ হলে ভালো কাজের মধ্যে সময় ব্যয় করার তাওফিক দান করুন। নফসের সব খারাপ প্ররোচণায় নিজেকে আল্লাহমুখী করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আমলের তাওফিক থেকে কেন বঞ্চিত হই

নেক মানুষের ক্ষেত্রে এমন হয়, যে আমলগুলো সে আগে করতো এখন তা করা বাদ দিয়েছে। এটি একটি নিন্দনীয় বিষয়। তবে তারচেয়ে বেশি নিন্দনীয় বিষয় হলো এই অধঃপতন ও অবনতি নিয়ে চিন্তিত না হওয়া। তারচেয়ে আরও বেশি নিন্দনীয় হলো এই বিষয়গুলোকে অবনতি বা অধঃপতন বলে মনে না করা। এরচেয়েও বেশি নিন্দনীয় হলো এমন অধঃপতন ও অবনতিতে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মনে করা যে তার সব কিছু ঠিকঠাকই আছে।

আল্লাহ তাআলা তাকে যখন সেই আমলগুলো করার তাওফিক দান করেছিলেন, তখন বেশি বেশি তাঁর শুকরিয়া আদায় না করার কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। যখন আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা হয় না, তখন বান্দাকে আমলের জায়গা থেকে সরিয়ে অবনতি আর অক্ষমতা ও নিষ্ক্রিয়তার স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়। তার দোষ-ত্রুটির সামনে আড়াল তৈরি করে দেওয়া হয়। ফলে মন্দ বিষয়গুলোই তার কাছে চমৎকার বলে প্রতিভাত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন- 'কাউকে যদি তার অসৎ কাজ সুশোভিত করে দেখানো হয় অতঃপর সে ওটাকে ভালো মনে করে, (সে কি ওই ব্যক্তির মতো, যে ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ মনে করে?)'

'এবং তারা ধারণা করে যে তারা ভালো কাজ করছে। (অথচ তাদের ধারণা সঠিক নয়।'

'এভাবেই প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের কর্মকে আমি সজ্জিত করেছি।'

'প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।'

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন- 'আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করবো যে তারা জানতে পারবে না।'

এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো, সদাসর্বদা আল্লাহ তাআমানুষের জীবনে প্রতিটি দিকই আল্লাহ তাআলার নেয়ামতে পরিপূর্ণ। এসব নেয়ামতের আলাদা আলাদা শুকরিয়া আদায় করা খুবই মুশকিল।

এ কারণেই প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দোয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার যাবতীয় অনষ্টির পাশাপাশি তার নেয়ামত থেকে যেন দূরে যেতে না হয়, সে জন্য আল্লাহর কাছে একান্ত প্রার্থনা করেছেন। হাদিসে এসেছে-

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার এটিও একটি ছিল যে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন যাওয়ালি নেমাতিকা ওয়া তাহাওউলি আফিয়াতিকা ওয়া ফুঝাআতি নিক্বমাতিকা ওয়া ঝামিয়ি সাখাত্বিকা।'

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়া থেকে। তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় চাই। তোমার কাছ থেকে হঠাৎ শাস্তি আসা থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার কাছে সব ধরণে অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই।' (মুসলিম)

মানুষের উচিত সব সময় প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো দোয়াটির মাধ্যমে যাবতীয় অনষ্টি থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি তার নেয়ামত লাভের দোয়া করা। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে কুরআন-সুন্নাহর মাসনুন দোয়াগুলোর মাধ্যমে রহমত ও নেয়ামত লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন। দিবেন।

মানুষের জীবনে প্রতিটি দিকই আল্লাহ তাআলার নেয়ামতে পরিপূর্ণ। এসব নেয়ামতের আলাদা আলাদা শুকরিয়া আদায় করা খুবই মুশকিল।

এ কারণেই প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দোয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার যাবতীয় অনষ্টির পাশাপাশি তার নেয়ামত থেকে যেন দূরে যেতে না হয়, সে জন্য আল্লাহর কাছে একান্ত প্রার্থনা করেছেন। হাদিসে এসেছে-

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার এটিও একটি ছিল যে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন যাওয়ালি নেমাতিকা ওয়া তাহাওউলি আফিয়াতিকা ওয়া ফুঝাআতি নিক্কমাতিকা ওয়া ঝামিয়ি সাখাত্বিকা।'

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়া থেকে। তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় চাই। তোমার কাছ থেকে হঠাৎ শাস্তি আসা থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার কাছে সব ধরণে অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই।' (মুসলিম)

মানুষের উচিত সব সময় প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো দোয়াটির মাধ্যমে যাবতীয় অনষ্টি থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি তার নেয়ামত লাভের দোয়া করা। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে কুরআন-সুন্নাহর মাসনুন দোয়াগুলোর মাধ্যমে রহমত ও নেয়ামত লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ইবাদতে স্বাদ অনুভব করেন যারা

মানুষের যখন ঈমানের পূর্ণতা আসে, তখন আল্লাহর ইবাদতে তৃপ্তি ও স্বাদ খুঁজে পায়। আর এই স্বাদ ও তৃপ্তি পার্থিব জীবনে মুসলমানের সর্বোত্তম প্রাপ্তি। যার ঈমানের দৃঢ়তা যত বেশি, সে ঈমানের মিষ্টতা ও ইবাদতের স্বাদ তত বেশি লাভ করে। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, 'তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে-১. আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তার কাছে সবকিছু থেকে বেশি প্রিয় হওয়া ২. কাউকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা ৩. কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করা' (বুখারি : ১৬)। অন্য হাদিসে এসেছে, 'সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে, যে আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (সা.)-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট' (তিরমিজি : ২৬২৩)।

যখন কোনো মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপে লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তরে ঈমানের নূর ও জ্যোতি কমে যায়। ফলে সে ইবাদতের স্বাদ হারিয়ে ফেলে। মানুষ যত বেশি পাপে নিমজ্জিত হবে সে ঈমান ও ইবাদতের স্বাদ থেকে তত বঞ্চিত হবে। আল্লামা ইবনে রজব (রহ.) বলেন, 'পাপের অনিবার্য পরিণতি হলো দুশ্চিন্তা, মানসিক কষ্ট, হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও মন্দ আচরণ, অন্তরের অন্ধকার ও কাঠিন্য এবং ইবাদতের স্বাদ হারিয়ে ফেলা।' আর আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 'পাপের একটি শাস্তি হলো অন্তরের মৃত্যু এবং জিকির, কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও মোনাজাতে স্বাদ হারিয়ে ফেলা।' (ইতহাফুল আশিকিন : ৪৩৭)
আমরাও যদি ইবাদতের স্বাদ ও তৃপ্তি লাভ করতে চাই তাহলে কিছু করণীয় রয়েছে। আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান, তাঁর ইবাদতে নিষ্ঠা ও জীবনের সর্বত্র দ্বীনের নিঃশর্ত আনুগত্য ছাড়া মানুষ ইবাদতের পরিপূর্ণ স্বাদ লাভ করতে পারে না। এককথায় যাকে আল্লাহর একনিষ্ঠ দাসত্ব বলা যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে, নামাজ কায়েম করতে ও জাকাত দিতে আর এটাই সঠিক দ্বীন' (সুরা

বাইয়িনাহ : ৫)। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, ‘মানুষের অন্তরে অপূর্ণতা রয়েছে, যা আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া ছাড়া পূর্ণ হয় না।

তাতে হিংস্রতা রয়েছে, যা একান্তে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করা ছাড়া দূর হয় না। তাতে দুশ্চিন্তা রয়েছে, যা আল্লাহর পরিচয় লাভ ও তাঁর হকগুলো আদায় করা ছাড়া দূর হয় না। তাতে অস্থিরতা রয়েছে, যা থেকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি দ্রুত এগিয়ে যাওয়া ও তাতে স্থির থাকা ছাড়া মুক্তি পাওয়া যায় না। তাতে আক্ষেপের আগুন আছে, যা তাঁর আদেশ, নিষেধ, সিদ্ধান্ত ও মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্তের (ভাগ্যের) ওপর সন্তুষ্টি ছাড়া নেভানো যায় না’ (তাতিরুল আনফাস মিন হাদিসিল ইখলাস : ৮২)। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, ‘পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে ঈমানের সঙ্গে ভালো কাজ করবে আমি তাকে উত্তম জীবনযাপন করাব’ (সুরা নাহল : ৯৭)। আল্লাহ তায়ালা বেশি বেশি ইবাদতের তওফিক দান করুন এবং অন্তরে ঈমানের স্বাদ ও তৃপ্তি দান করুন।

অন্যের দোষ তালাশ করাঃ

মানুষের হাত ধরে দেশ, শহর, গ্রাম, পাড়া, মহল্লার সৃষ্টি হয়। মানুষই এসব কিছুর নিয়ন্ত্রক। মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা, অন্যায়-অবিচার, দুঃশাসন দেখা দিলে দেশ, সমাজ, গ্রামে অশান্তি নেমে আসে। পরস্পর ক্ষতিসাধনে লিপ্ত হলে বিপর্যয়ে ছেয়ে যায় মানুষের জীবনযাপন।

ছিদ্রান্বেষণকারীর অত্যাচারে শান্তি-স্বস্তিতে থাকতে পারে না ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা মানুষের দোষ অনুসন্ধান ও ব্যক্তির পেছনে অকারণে গোয়েন্দাগিরি করতে নিষেধ করেছেন। ইসলামে অন্যের দোষ অনুসন্ধান ও মন্দ ধারণা করা পাপ। আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদাররা, তোমরা বেশি অনুমান থেকে বেঁচে থাকো।

কারণ কিছু কিছু অনুমান তো পাপ এবং তোমরা কারোর গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করো না।’ (সুরা : হুজরাত, আয়াত : ১২)

মানুষের ব্যক্তিগত পাপাচার ও দোষ অনুসন্ধান করা, ক্ষতি করা, ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনের জন্য কারো পেছনে লেগে থাকা ও গোয়েন্দাগিরি করা নিষিদ্ধ। লুকিয়ে কারো কথা শোনা, ঘরের ভেতর উঁকি দেওয়া, ফেসবুকের আইডি হ্যাক করা, পাসওয়ার্ড চুরি করা,

ইনবক্স চেক করা, গোপনীয়ভাবে কারো ছবি তোলা, ভিডিও ধারণ করা, কথা রেকর্ড করা ইত্যাদি হারাম। তবে দেশ, সমাজ ও মানুষের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা প্রকল্পে, চোর-ডাকাত, খুনি, সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, মাদক কারবারি, ঋণখেলাপি, প্রতারক ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত লোকদের খোঁজে বের করতে গোয়েন্দাগিরি করা যাবে ।

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গোয়েন্দা নিযুক্ত করতে কোনো অসুবিধে নেই।

দোষ গোপন রাখায় আছে পুরস্কার : মানুষের দোষ গোপন রাখা মহৎ কাজ। দোষ-ক্রুটি প্রকাশের ফলে ব্যক্তি সানন্দে জীবনযাপন করতে পারে না। চলাফেরার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। পৃথিবী তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়।

মানুষের কল্যাণার্থে মানুষের দোষ-ক্রুটি গোপন রাখা অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা দোষ-ক্রুটি গোপনকারীর দোষ গোপন করেন। তাকে উভয় জগতে পুরস্কৃত করেন। মানবতার নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৯৪৫)

দোষ অনুসন্ধানকারীর শাস্তি ভয়াবহ : পরের দোষ খোঁজা নিন্দনীয়। কোনো গোপনীয় সভা কিংবা দলের পেছনে অকারণে গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করা গুনাহ। মানুষের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যদি তাদের কথা শোনে; গোয়েন্দাগিরি করে তাহলে তার জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি। রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের কথা গুপ্তভাবে শুনল; অথচ সে তাদের কথাগুলো শুনুক তারা তা পছন্দ করছে না অথবা তারা তার অবস্থান টের পেয়ে তার থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে, কিয়ামতের দিন এ জন্য তার কানে সিসা ঢেলে দেওয়া হবে।’ (বুখারি, হাদিস : ৭০৪২)

আরেকটি হাদিসে কথাটি আরো সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, ‘হে লোকেরা, তোমরা যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ; অথচ ঈমান তোমাদের অন্তরে ঢোকেনি, তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিয়ো না। তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কারণ যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান করল, আল্লাহ তাআলা তার দোষ অনুসন্ধান করবেন। আর যার দোষ আল্লাহতায়ালা অনুসন্ধান করবেন তাকে অবশ্যই তিনি লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন, যদিও সে নিজ ঘরের অভ্যন্তরেই অবস্থান করুক না কেন।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২০৩২)

অপ্রয়োজনে গোয়েন্দাগিরি নিষেধ : রাষ্ট্র বিনা কারণে কারো দোষ অনুসন্ধান করলে, ব্যক্তির বাঁচার কোনো উপায় থাকে না। তবে কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষতির

আশঙ্কা থাকলে, তার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা যাবে। জায়িদ ইবনে ওয়াহব (রহ.) বলেন, ‘একবার এক ব্যক্তিকে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে এনে বলা হলো, এই সেই লোক, যার দাড়ি থেকে মদ টপকে পড়ছে।’ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমাদের জন্য গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি প্রকাশ্যে কোনো অন্যায় আমাদের সামনে ধরা পড়ে, তাহলে এর জন্য আমরা তাকে ধরব।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৮৯০)

হাদিস থেকে বোঝা যায় মানুষের প্রাইভেসির সঙ্গে তার সম্মান জড়িত। কারও সম্মানে আঘাত করা বা কাউকে অপমানিত করা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। স্পষ্ট হারাম এটা। তাই কারও কোনো গোপন বিষয় জেনে গেলেও তা অন্যের কাছে প্রকাশ করব না। নবিজি (সা.) বলেছেন, ‘যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন করল, আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন’। (সহিহ মুসলিম)।
হজরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল (সা.) বলতে শুনেছি, ‘যদি তুমি মুসলমানদের দোষ তালাশের পেছনে পড়, তাহলে তাদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়বে। অথবা ফ্যাসাদে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হবে।’ (আবু দাউদ ৪৮৮৮)। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এ নিষেধাজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করতেন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়, একবার তার কাছে এক লোককে ধরে এনে বলা হলো, এ ব্যক্তির দাড়ি থেকে মদ ঝরে পড়ছে (অর্থাৎ, সে মদ খেয়েছে)। তখন তিনি বলে উঠলেন, আমাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি আমাদের সামনে কিছু প্রকাশ পায়, তা আমরা আমলে নেব। (আবু দাউদ-৪৮৯০)।
এখানে স্পষ্ট আলামত ছিল, যার সূত্র ধরে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ওই ব্যক্তির মদপানের বিষয়টা প্রমাণ করতে পারতেন। কিন্তু শরিয়তের নিষেধাজ্ঞার কারণে অহেতুক তার পেছনে পড়েননি। এখানে আমাদের জন্য অনুপম আদর্শ ও শিক্ষা রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি ও মানুষের পেছনে পড়াসহ সব ধরনের নিন্দনীয় কাজ থেকে হেফাজত করুন! উত্তম ও পরিশীলিত জীবন গঠনের তাওফিক দিন!

অন্তরকে মৃত বানিয়ে ফেলা

ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, অন্তরের রোগ দু'প্রকার: مَرَضُ شَهْوَةٍ বা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার রোগ[1] এবং ومرض شبهة বা দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ ও وأردؤها مَرَضُ الشُّبْهَةِ শির্ক-বিদআতে লিপ্ত হওয়ার রোগ।

প্রবৃত্তির অনুসরণের রোগের চেয়ে দ্বীনের মধ্যে সন্দেহ পোষণ ও শির্ক-বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার রোগ অধিক নিকৃষ্ট। আর সন্দেহের রোগসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম হলো তাকদীরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। অন্তরের রোগ বৃদ্ধি পেতে পেতে কখনো কখনো এমন জটিল আকার ধারণ করে যে, মানুষ তা অনুভব করতে পারে না। অন্তরের সুস্থতা ও অসুস্থতা এবং তার কারণসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেই অন্তরের রোগ বাড়তে থাকে। কখনো কখনো মানুষের অজামেত্মই অন্তর মারা যায়। মৃত অন্তর ওয়ালা মানুষের আলামত হলো, খারাপ কাজ করার পরও তার অন্তর ব্যথিত হয় না এবং সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা ও বাতিল আক্বীদাহ পোষণ করেও কষ্ট অনুভব করে না।

জীবন্ত অন্তরের জীবনী শক্তি অনুপাতে তার মধ্যে খারাপ জিনিস প্রবেশ করার কারণে উহা কষ্ট পায় এবং হক সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেও অন্তর ব্যথিত হয়। কিন্তু মরা অন্তর কিছুতেই ব্যথিত হয় না।

আরবী প্রবাদে বলা হয়েছে ما لجرح بميت إيلام মৃত ব্যক্তির শরীর আহত হলেও ব্যথা অনুভব করে না। যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত তারা তাদের রোগ সম্পর্কে অনুভব করতে পারলেও এর সুস্থতার জন্য তিক্ত ঔষধ গ্রহণ করা এবং তার উপর ধৈর্যধারণ করা অত্যন্ত কষ্টকর। রোগাক্রান্ত অন্তরের চিকিৎসার জন্য ঔষধ সেবন করা খুবই কষ্টকর। কারণ এর ঔষধ সেবন করতে গেলে তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা আবশ্যক। এ ঔষধ গ্রহণ করা নফ্সের জন্য সর্বাধিক কষ্টকর। তবে এর চেয়ে অধিক উপকারী ঔষধ আর নেই।

অন্তরের রোগে আক্রান্ত লোকেরা কখনো ধৈর্যসহকারে তিতা ঔষধ সেবন করে। অতঃপর তাদের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যায়। ফলে তারা চিকিৎসা গ্রহণের উপর স্থির থাকতে পারে না। কেননা তার ইলম, দূরদর্শিতা ও সবর খুবই দুর্বল। যেমন কেউ এমন পথ অবলম্বন করলো, যা অত্যন্ত ভীতিকর। কিন্তু এ পথ তাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ একটি স্থানে নিয়ে যাবে। সে ভালো করেই জানে, সে যদি সবর করে এবং যাত্রা

অব্যাহত রাখে, তাহলে অচিরেই ভয় চলে যাবে। ভয়ের পরেই সে নিরাপত্তা লাভ করবে। সুতরাং গন্তব্য স্থানে পৌঁছার জন্য প্রচুর ধৈর্যধারণ করা এবং সফলতা সম্পর্কে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। তার ধৈর্য যদি কমে যায় এবং ঈমান যদি দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে সে মাঝ পথ থেকে ফিরে আসবে। সে পথ চলার কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না। বিশেষ করে যখন যাত্রা পথে যখন ভালো বন্ধু পাবে না বা চলার পথে একাকীত্ব অনুভব করবে। সে যদি বলতে থাকে বাকী লোকেরা কোথায় গেল? তারা যেদিকে চলে গেছে, আমারও সেদিকে যাওয়া উচিত। অধিকাংশ মানুষেরই এ অবস্থা। এটিই তাদেরকে ধ্বংস করেছে।

কিন্তু পর্বত প্রমাণ ধৈর্যশীল ও সত্যান্বেষী মুমিন কখনো সত্যের পথের সাথী কম হওয়ার কারণে একাকীত্ব অনুভব করে না। সাথী না থাকলেও সে বিচলিত হয় না। বিশেষ করে যখন সে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রথম সারির লোকদের সঙ্গী-সাথী ও সমর্থক হওয়ার দিকে নযর দিবে, তখন সে মনোবল ও সৎ সাহস ফিরে পাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

‘‘আর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা ঐ সমস্ত লোকের সাথে থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন; তারা হলেন নাবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। কতইনা উত্তম বন্ধু তারা’’ (সূরা আন নিসা ৪:৬৯)।

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে ইসমাঈল আবূ শামা রহিমাহুল্লাহ الْحَوَادِثُ وَالْبِدَعُ "আল হাওয়াদিছু ওয়াল বিদা" নামক গ্রন্থে কতই না সুন্দর বলেছেন। তিনি বলেছেন, মুসলিমদেরকে জামা‘আতবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে জামা‘আত বলতে হক তথা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং তার অনুসরণ করা উদ্দেশ্য। হকপন্থীদের সংখ্যা যদিও কম হয় এবং তাদের বিরোধীদের সংখ্যা বেশী হলেও তারা জামা‘আত। কেননা এ হকের উপরই ছিলেন নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবীগণ। তারাই উম্মতে মুহাম্মাদীর হকপন্থী প্রথম জামাআত। ছাহাবীদের যুগের পরে বাতিলপন্থীদের সংখ্যা বেশী হলেও সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে না।

ইমাম হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর শপথ! বাড়াবাড়ি ও কট্টরপন্থার মাঝখানেই সুন্নাত। সুতরাং আপনারা সুন্নাতের উপর সবর করুন। আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন। পূর্ববর্তী কালে আহলে সুন্নাতের সংখ্যা একদম কম ছিল এবং এখনো তাদের সংখ্যা খুব কম। তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত লোকদের সাথে

ছিলেন না এবং বিদ‘আতীদের বিদ‘আতের সাথেও শরীক ছিলেন না। তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাত করার পূর্ব পর্যন্ত সুন্নাতের উপর ধৈর্যধারণ করেছেন। সুতরাং আপনারাও তাদের মত হয়ে যান।

অন্তর রোগাক্রান্ত হওয়ার আলামত হলো তা উপকারী খাদ্য বাদ দিয়ে ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণ করে এবং উপকারী ঔষধ বর্জন করে ক্ষতিকর ঔষধ সেবন করে। সুতরাং এখানে চারটি জিনিস রয়েছে।

(ক) উপকারী খাদ্য, (খ) শিফা দানকারী ঔষধ, (গ) ক্ষতিকর খাদ্য, (ঘ) ক্ষতিকর ঔষধ।

পরিশুদ্ধ অন্তর উপকারী খাদ্য ও শিফা দানকারী ঔষধ গ্রহণ করে এবং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ঔষধ পরিহার করে। অসুস্থ অন্তর এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

অন্তরের জন্য ঈমানের খোরাকই সর্বোত্তম খোরাক, কুরআনের চিকিৎসাই সর্বোত্তম চিকিৎসা। ঈমান ও কুরআন -এ দু’টির মধ্যেই খাদ্য ও চিকিৎসা রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে অন্যত্র চিকিৎসা অনুসন্ধান করবে সে সর্বাধিক মুর্খ ও গোমরাহ বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

‘‘এদের বলো, এ কুরআন মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রোগ মুক্তি স্বরূপ। কিন্তু যারা ঈমান আনে না এটা তাদের জন্য পর্দা ও চোখের আবরণ। তাদের অবস্থা হচ্ছে এমন যেন দূর থেকে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে’’ (সূরা হা-মীম সাজদা ৪১:৪৪)। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

‘‘আমি এ কুরআনের অবতরণ প্রক্রিয়ায় এমন সব বিষয় অবতীর্ণ করছি যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত এবং যালেমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না’’। (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮২)

এখানে من হরফে জারটি পূর্বোক্ত বিষয়ের পূর্ণ ব্বিরণের জন্য এসেছে; কিয়দাংশ বর্ণনার জন্য নয়। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

‘‘হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে নেয় তার জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত’’ (সূরা ইউনূস ১০:৫৭)।

শরীর ও অন্তরের সকল রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য কুরআন হলো পরিপূর্ণ চিকিৎসা। কুরআনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল রোগ ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। তবে সব মানুষই কুরআনের চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য লাভ করার যোগ্য নয়।

রোগী যখন ঔষধ সেবন করার সর্বোত্তম পন্থা ব্যবহার করতে শিখবে, অতঃপর পরিপূর্ণ সত্যায়ন, বিশ্বাস, কবুল ও শর্তসমূহ বাস্তবায়ন করার পর নিজের জন্য উহা ব্যবহার করবে, তখন কোনো রোগই তার মোকাবেলা করতে পারবে না। রোগ-ব্যাধির পক্ষে আসমান-যমীনের প্রভুর কালামের মোকাবেলা করা কিভাবে সম্ভব!! আল্লাহর কালাম যদি পাহাড়ের উপর নাযিল হতো, তাহলে উহা পাহাড়কে বিদীর্ণ করে ফেলতো, যমীনের উপর নাযিল হলে যমীনকে ফাটিয়ে ফেলতো। অন্তর ও শরীরের রোগসমূহের প্রত্যেক রোগের চিকিৎসার নির্দেশনা কুরআনে রয়েছে। যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন তার জন্য কুরআনের মধ্যেই সকল রোগ ও তার কারণ থেকে বাঁচার ব্যবস্থাও রয়েছে। ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما

নিশ্চয়ই সে স্বীয় ধারণা অনুসারে গায়েবের একটি গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছে। অর্থাৎ ধারণার বশবতী হয়ে গায়েবী বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে একটি গুপ্ত গায়েবী বিষয় উন্মোচন করার চেষ্টা করেছে। কেননা তাকদীরের বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে একটি গুপ্ত বিষয় হিসাবে স্বীকৃত। যে এ বিষয়ে গবেষণা করতে যাবে, সে গায়েবী বিষয় অবগত হওয়ার চেষ্টাকারী হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তার মনোনীত কোন রসূল ব্যতীত। (সূরা আল জিন ৭২ : ২৬-২৭) সুতরাং তাকদীর তথা গায়েবী বিষয়ে মন্তব্যকারী মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী হিসাবে পরিগণিত হবে।

[1]. শাহওয়াত বা প্রবৃত্তির রোগে আক্রান্ত অন্তর ওয়ালা লোকেরা সবসময় অশ্লীল কাজের প্রতি আসক্ত থাকে এবং পরনারীর কণ্ঠ শুনলেই তাদের অন্তর সেদিকে ঝুকে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

‘‘হে নারীগণ! তোমরা চিকন কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। আর তোমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলো’’ (সূরা আহযাব ৩৩:৩২)। আর যাদের অন্তরে শুবুহাত তথা নিফাকি, শির্ক-বিদআত ও দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহের রোগে আক্রান্ত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ‘‘তাদের হৃদয়ে আছে একটি রোগ, আল্লাহ সে রোগ আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর যে মিথ্যা তারা বলে তার বিনিময় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’’। (সূরা আল বাকারা ২:১০) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

‘‘তবে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তাদের পূর্ব অপবিত্রতার সাথে আরো অপবিত্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা কাফের অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেছে’’ (সূরা আত-তাওবা ৯:১২৫) এই আয়াত দু’টিতে অন্তরের সন্দেহের রোগের কথা বলা হয়েছে। এটি সর্বাধিক নিকৃষ্ট রোগ।

ইলমের মাধ্যমে দুনিয়া তালাশ করা

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَأْ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। -শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعملِ.

(সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)
এই কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ. বলেছেন, যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরয তার ইলম অর্জনও ফরয। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার ইলম অর্জনও সুন্নত। তদ্রƒপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরয। যা মাকরূহে তাহরীমী তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়।

ইলম তলবের গুরুত্ব, ফযীলত ও আদব

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَأْ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২
দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। -শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعملِ.

(সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)

এই কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ. বলেছেন, যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরয তার ইলম অর্জনও ফরয। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার ইলম অর্জনও সুন্নত। তদ্রƒপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরয। যা মাকরূহে তাহরীমী তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়।

ইলমে দ্বীনের ফযীলত

সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। -সূরা আলাক (৯৬) : ১-৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? -সূরা যুমার (৩৯) : ৯

কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। -সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

আরো ইরশাদ করেছেন-

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই. যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

.مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। -আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

.مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল। -জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-

.مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلّا لِخَيْرٍ يَتَعَلّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثَةٍ :إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ .وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল তাই এর আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সেগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে।

নিয়ত বিশুদ্ধ করা

সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে। আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-
لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّارَ.

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-
لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيَّتُه.

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে। -আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভ,ত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করব এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব।

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। এক. কারো লেখা পাঠ করা। দুই. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা। এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। প্রথম পদ্ধতির সবচে বড়

উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنّمَا الْعِلْمُ بِالتّعَلّمِ.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে। -সহীহ বুখারী ১/২৪

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন-

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصّحُفِ.

ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়। -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিক্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর 'আলমুআফাকাত' গ্রন্থে লিখেছেন-

قالوا إِنّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ.

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে। -আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন-

إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ। -সহীহ মুসলিম ১/১৪

ইলমের জন্য দরকার মেহনত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

إِنّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتّعَلّمِ.

তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে। -আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন-

بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ.

অধিক জিজ্ঞাসাকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে। -ফাযাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ ২/৯৭০; আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লাহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।

একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত-

كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنَّا.

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। -সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০; তবাকাতু ইবনে সা'দ ২/২৮৪

আল্লাহর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হওয়া

কীভাবে বুঝব আল্লাহ আমার ওপর অসন্তুষ্ট

মহান আল্লাহ তাআলা সুন্দর অবয়বে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।
’ (সুরা ত্বিন, আয়াত : ৪)

বান্দার ওপর তার সৃষ্টিকর্তা যদি অসন্তোষ থাকেন, তাহলে তার ক্ষতি অনিবার্য। একজন মানুষ কীভাবে অনুভব করবে যে তার প্রভু তার প্রতি অসন্তুষ্ট।

কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে এ কথা বলা যাবে না যে আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট, অথবা আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন না। কারণ এ ব্যাপারে প্রকৃত ইলম (জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহর।

তবে কোরআন ও হাদিসে এমন কিছু নিদর্শন এসেছে, যার দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট।

নির্দয় হওয়া : অন্তর কঠোর হওয়া ও মানুষের প্রতি নির্দয় হওয়া।

আপনজনের সঙ্গে মন্দ আচরণ করা। আর আল্লাহ যখন কোনো বান্দার ওপর রাগান্বিত হন, তখন তার দিল থেকে দয়া উঠিয়ে নেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, হে আয়েশা, তুমি কখন আমাকে অশালীন দেখেছ? কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার অনিষ্টের কারণে মানুষ তাকে ত্যাগ করে। ' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৩২)

বরকত উঠিয়ে নেন : আল্লাহ তাআলা যখন কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হন তখন তার জীবন থেকে বরকত উঠিয়ে নেন এবং তার ওপর বিভিন্ন ধরনের শত্রু নিয়োজিত করে দেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূ-গর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। ' (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪০)

যেকোনো মুসিবতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা : আল্লাহ যখন বান্দাকে পরীক্ষা কিংবা অন্য কোনো কারণে বিপদাপদ দেন; তখন তাঁর প্রতি বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা আল্লাহ তাআলাকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। আনাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদের (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহ তাআলার) সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহ তাআলার) অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৩৯৬)

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করা : আল্লাহ তাআলা চান তাঁর বান্দা তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। আল্লাহ বলেন, ‘আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। ’ (সুরা গাফির, আয়াত : ৬০)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলার কাছে যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। ’ (তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৭৩)

অহংকারী হওয়া, সত্যকে গোপন করা : অন্যকে ছোট করার মানসিকতা থাকা, মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা থাকা। যার ফলে সে ভালো কাজ করে লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের জন্য। তার চাওয়া-পাওয়া একমাত্র তার প্রবৃত্তিকে পূরণ করা। তার প্রবৃত্তি তার প্রভু হয়ে যায়। পরকাল থেকে সম্পূর্ণ থাকে সে উদাসীন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না। ’ (সুরা নাহল, আয়াত : ২৩)

নিয়ামত অস্বীকার করা : প্রতিটি বান্দার ওপর দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা আল্লাহ তাআলার হাজারো নিয়ামত বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু যারা অকৃতজ্ঞ তারা আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত পেয়েও তা অস্বীকার করে। আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ বলেন, ‘যদি তোমরা অস্বীকার করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের থেকে বেপরওয়া। তিনি তাঁর বান্দাদের কাফির হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। ’ (সুরা জুমার, আয়াত : ৭)

খিয়ানত করা : কথা ও কাজে যখন আপনি খিয়ানত করবেন তখন বুঝবেন যে আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর অসন্তুষ্ট। তাই আপনি আপনার জীবনে খেয়ানত করেই চলেছেন। আল্লাহ বলেন, ‘আর যারা নিজেদের সঙ্গেই খিয়ানত করে তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো খিয়ানতকারী ও পাপীষ্ঠকে পছন্দ করেন না। ’ (সুরা নিসা, আয়াত : ১০৭)

সীমা লঙ্ঘন করা : যেকোনো কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। কোনো ক্ষেত্রে প্রান্তিকতা না করা। বাড়াবাড়িও করবে না, আবার শিথিলতা করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমা লঙ্ঘন কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। (সুরা বাকারা, আয়াত : **১৯০**)

তায়াক্কুলের ক্ষেত্তে ভুল পথে হাটা

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা মুমিনের অন্যতম গুণও বটে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ- 'মুমিনতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয়, যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর আয়াত তাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরেই নির্ভর করে' *(আনফাল ২)*। তিনি আরো বলেন, الَّذِينَ آمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ 'যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকেরই উপর নির্ভর করে' *(নাহল ৯৯; শূরা ৩৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ 'যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে' *(নাহল ৪২; আনকাবূত ৫৯)*। অন্য আয়াতে তিনি আরো বলেন, وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ- 'মুমিনদের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিৎ' *(ইবরাহীম ১১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ- 'যখন তুমি কোন কাজের সিদ্ধান্ত কর, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ- 'যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আললাহই তার জন্য যথেষ্ট' *(তালাক্ব ৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ 'আল্লাহ ছাড়া আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তার উপর ভরসা রাখি, আমি তার নিকট ফিরে যাব *(হূদ ৮৮)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহর উপর নির্ভর করা। ইবাদত-বন্দেগী, তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকার ইত্যাদির পাশাপাশি ধৈর্য ধারণ করে হালাল-হারাম বেছে চলা আবশ্যক। সেই সাথে পাপকাজ থেকে বেঁচে থেকে তাক্বওয়া ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করতে হবে। অন্তরে আল্লাহভীতি না থাকলে মানুষ যে কোন পাপে লিপ্ত হতে পারে। অপরপক্ষে তাওয়াক্কুল মানুষকে অন্যায় পন্থায় অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখে এবং মানুষকে অনেক বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।

আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا 'আপনি চিন্তা করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন' *(তওবা ৪০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 'তারপর উভয় দল যখন মুখোমুখী হল, তখন মূসার সাথীরা চিৎকার করে বলে উঠল, আমরাতো বন্দী হয়ে গেলাম। মূসা (আঃ)বললেন, কখনো নয়, নিশ্চয়ই আমার সাথে রয়েছেন, আমার প্রতিপালক। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। তখন আল্লাহ বলেন, আমি মূসাকে অহি-র মাধ্যমে বললাম, সাগরের উপর আপনার লাঠি মারুন। সহসা সাগর বিদীর্ণ হল এবং তার প্রতি অংশ এক একটি বিরাট পাহাড়ের আকার ধারণ করল' *(শু'আরা ৬১-৬৩)*। এ আয়াতে বাহ্যিকভাবে তাঁদের বাঁচার কোন পথ ছিল না। কারণ ডানে-বামে পিছনে শত্রুদল। আর সামনে সাগর। এরপরেও মূসা (আঃ) আল্লাহর উপর দৃঢ় ভরসা রেখে বলছেন, কখনো নয়, অসম্ভব হতেই পারে না। ফেরাউন আমাকে ধরতে পারবে না। কারণ নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি আমাকে বাঁচার পথ দেখাবেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে,رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 'ফেরাউনের স্ত্রী (আছীয়া) বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং আমাকে ফেরাউন ও তার কর্ম হতে রক্ষা কর। আর অত্যাচারী লোকদের কবল হতে আমাকে বাঁচাও' *(তাহরীম ১১)*।

আল্লাহর উপর তার ভরসা কেমন ছিল এবং তার ঈমানী দৃঢ়তা কতটা মযবুত ছিল, তা এ ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয়। তিনি পৃথিবীতে থেকেই জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণের জন্য আল্লাহর নিকট জোরাল দাবী জানান।

জিবরাঈল (আঃ) যখন মানুষের রূপ ধরে মারিয়ামের কাছে প্রবেশ করলেন, তখন মারিয়াম বললেন, قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا নিশ্চয়ই আমি রহমানের নিকট তোমার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। যদি তুমি পরহেজগার হও' *(মারিয়াম ১৮)*। এ আয়াতটি মারিয়ামের আল্লাহর উপর ভরসার প্রমাণ বহন করে। তিনি নিজেকে রহমানের সাহায্যে বাঁচাতে চাইলেন।

ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ 'একদা সে ঘরের দরজা বন্ধ করে বলল, এবার তুমি আস। ইউসুফ বললেন, আমি আল্লাহর নিকট এমন কাজ হতে আশ্রয় চাই। নিশ্চয়ই তিনি আমার মালিক, তিনি আমার উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই অপরাধীরা সফল হয় না' *(ইউসুফ ২৩)*। এ আয়াত ইউসুফ (আঃ)-এর ঈমানী দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি তার নির্ভরতার প্রমাণ।

ভালো কাজের ক্ষেত্রে রাসুল (সা.)-এর পরামর্শ

গভীরে হারিয়ে যায় সময়, সুযোগ ও সক্ষমতা! মহান আল্লাহ বলেন, '(ওয়াল আসর) মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত...।' (সুরা : আসর, আয়াত : ১)

মহান আল্লাহ বলেন, 'সৎকর্ম ও ধর্মভীরুতায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করো। মন্দকর্ম ও সীমা লঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা কোরো না...।

আর ইবনে উমর (রা.) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা কোরো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা কোরো না...।' (বুখারি)

মহান আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতি আমলে অগ্রসর থাকা এবং প্রতিযোগিতা করা ঈমানি পূর্ণতার পরিচায়ক। মহান আল্লাহর নির্দেশ—'তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৪৮)

এখানে 'প্রতিযোগিতা' ও 'অগ্রসর' শব্দের ব্যাখ্যা হলো—'অন্যের চেয়ে এগিয়ে থাকা' এবং 'ভালো কাজ শিগগিরই সম্পন্ন করা' ইত্যাদি।

জীবন ক্ষণস্থায়ী, মানুষের সাধ্য-সামর্থ্য দ্রুত ফুরায়, তবু হাদিসের ভাষায় 'সুস্থতা ও অবসরের ব্যাপারে মানুষ খুবই উদাসীন।' (বুখারি)

কাজেই সৎকর্মে বিলম্ব নয়। প্রিয় নবী (সা.) বলেন, সাতটি বিষয়ের আগে দ্রুত সৎকর্ম করো :

ক) তোমরা কি এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষা করছ, যা তোমাদের সব কিছু ভুলিয়ে ফেলবে?

খ) নাকি ওই ঐশ্বর্যের, যা তোমাদের অহংকারী বানিয়ে ছাড়বে?

গ) নাকি এমন অসুস্থতার, যার আঘাতে তোমরা জরাজীর্ণ হয়ে পড়বে?

ঘ) নাকি ওই বার্ধক্যের, যা তোমাদের অথর্ব-অপদার্থ বানিয়ে ছাড়বে?

ঙ) নাকি মৃত্যু, যা শিগগিরই এসে যাবে?

চ) নাকি দাজ্জালের, অনুপস্থিত যা কিছুর জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে, দাজ্জাল হচ্ছে সেসবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট?

ছ) নাকি কিয়ামতের অপেক্ষা করছ, যে কিয়ামত সর্বাপেক্ষা বিভীষিকাময় ও সর্বাপেক্ষা তিক্ত? (তিরমিজি)

অন্যদিকে প্রিয় নবী (সা.) বিশেষ তিনটি কাজে বিলম্ব করতে নিষেধ করে বলেন, 'তিন কাজে বিলম্ব করবে না। সময় হয়ে গেলে নামাজ আদায়ে, লাশ এসে গেলে জানাজা আদায়ে এবং পাত্রপাত্রীর 'কুফু' (পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা) পাওয়া গেলে বিবাহে।' (তিরমিজি)

অপর এক হাদিসে আছে—'পাপ কাজের জন্য তাওবা করা ও ঋণ পরিশোধে বিলম্ব না করা।

'

ইসলামের দৃষ্টিতে সৎকর্মকে আমলে সালেহ বলে। ঈমান ছাড়া আমলে সালেহ বা ভালো কাজ মূল্যহীন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে, তার জন্য থাকবে সর্বোত্তম পুরস্কার...।' (সুরা : কাহফ, আয়াত : ৮৮) মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'ঈমান এনে যেকোনো পুরুষ বা নারী আমলে সালেহ করবে, আমি তাকে দান করব উত্তম পবিত্র জীবন এবং তাদের পুরস্কার দেব তাদের সবচেয়ে ভালো কাজগুলোর ভিত্তিতে।' (সুরা : আন-নাহল, আয়াত : ৯৭)

আমলে সালেহের ন্যূনতম ভিত্তি

১. ইলম (এ কথা জানা যে এ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও হুকুম আছে)

২. সবর

৩. নিয়ত ও

৪. ইখলাস।

ভালো কাজে বিলম্ব করা উচিত নয়। কেননা মানুষের জীবন বয়সসীমা ও মৃত্যুফ্রেমে বাঁধানো। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন তাদের নির্ধারিত (মৃত্যুর) সময় উপস্থিত হয়, তখন তারা আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে পারে না এবং এর চেয়ে একটু এগিয়েও আসতে পারে না।' (সুরা : ইউনুস, আয়াত : ৪৯)

পরিশেষে কবির ভাষায় নিবেদন

'...ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না।
আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই বলেই কি রইবি থেমে—
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্বলবে না।
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী
হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গলবে না।
বদ্ধ দুয়ার দেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে... ।'

ভালো কাজের ইচ্ছা যেভাবে কল্যাণ বয়ে আনে

মানুষের ইচ্ছা থেকেই ভালো বা মন্দ কাজ হয়ে থাকে। মানুষ যখন ভালো কাজের ইচ্ছা করে তখন তা পালন সহজ হয়, খারাপ কাজের ক্ষেত্রে বিবেক অবশ্যই বাধা দিয়ে থাকে তবে এরপরও অনেক মন্দ কাজের জড়িয়ে পড়েন। ভালো বা মন্দ যেই কাজই হোক না কেন- সব নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছা শক্তির ওপর।

এ বিষয়ে হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'অবশ্যই আমলের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।' (সহিহ বুখারি, হাদিস, ১)

কোনো কিছু করার আগে ভালো-মন্দ ভেবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কারণ, ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের ওপরই প্রতিদান দেওয়া হবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভালো উপার্জন (কাজ) করবে, সে তার প্রতিদান পাবে; এবং যে মন্দ উপার্জন (কাজ) করবে, সে তার প্রতিফল পাবে।' (সূরা বাকারা, আয়াত, ২৮৬)

এজন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। হাদিসে পাকে ইরশাদ হয়েছে-

হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, 'আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি কল্যাণমূলক কাজ করবে তার জন্য রয়েছে অনুরূপ ১০টি কল্যাণমূলক পুরস্কার; এমনকি আমি তা বাড়িয়ে দেব। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করবে তার জন্য রয়েছে অনুরূপ একটি মন্দ প্রতিদান অথবা আমি তাকে ক্ষমা করে দেব (যদি সে অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চায় ও ভবিষ্যতে অন্যায় কাজ না করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে)

আর যে ব্যক্তি আমার (আনুগত্যের) দিকে এক বিঘত (আধা হাত) এগিয়ে আসবে আমি তার (কল্যাণে) প্রতি এক হাত এগিয়ে আসব।

আর যে ব্যক্তি আমার (আনুগত্যের) দিকে এক হাত এগিয়ে আসবে আমি তার (কল্যাণে) প্রতি এক বাহু (দুই বাহু সমান) এগিয়ে আসব।

আর যে ব্যক্তি আমার (আনুগত্যের) দিকে হেঁটে আসবে; আমি তার (কল্যাণের) দিকে দৌড়ে যাব।

আর যদি কেউ আমার সঙ্গে শিরক না করে (আমার সঙ্গে শরিক বা অংশদার সাব্যস্ত না করে) পৃথিবীসম গোনাহ (পাপ) নিয়ে আমার সামনে হাজির হয় (আমার কাছে ক্ষমা চায় ও তাওবা করে) তবে আমিও তার সামনে অনুরূপ (পৃথিবীসম) বিশাল ক্ষমা নিয়ে হাজির হব।' (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ)

আরেক হাদিসে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মহান প্রভূর সূত্রে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ভালো কাজ ও মন্দ কাজের সীমা চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং সেগুলো বৈশিষ্ট্যও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের সংকল্প করে, কিন্তু তা সম্পাদন করেননি, আল্লাহ তার আমলনামায় একটি পূর্ণ সাওয়াব বা প্রতিদিন লেখার আদেশ দেন। আর (ভালো কাজের) সংকল্প করার পর যদি কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়, তবে আল্লাহ তার আমলনামায় ১০ নেকি থেকে শুরু করে ৭০০; এমনকি তার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি সাওয়াব দান করেন।

পক্ষান্তরে... যদি কোনো মানুষ মন্দ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, সঙ্গে সঙ্গে তার আমলনামায় গোনাহ লেখা হয় না। তবে যখন সে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে তখন শুধু মাত্র একটি মন্দ কাজের জন্য একটি গোনাহ লেখা হয়।'(বুখারি ও মুসলিম)

ভালো কাজের সওয়াব যেভাবে বৃদ্ধি পায়

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারিম (সা.) আল্লাহ তাআলা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ নেক কাজ ও গুনাহের কাজ লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন; যে ব্যক্তি নেক কাজ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু এখনো তা বাস্তবে আমল করেনি। আল্লাহ তার জন্য তাঁর কাছে একটি পরিপূর্ণ নেকি লিপিবদ্ধ করেন। আর যদি সে নেক কাজ করার ইচ্ছা করে এবং তার ওপর আমল করে তা হলে আল্লাহ তাঁর কাছে ১০ থেকে ৭০০ গুণ বা আরো বেশি বাড়িয়ে নেকি লিপিবদ্ধ করেন।

যদি সে গুনাহের কাজের ইচ্ছা করে এবং তা বাস্তবে পরিণত না করে, তবে আল্লাহ তাঁর কাছে একটি পরিপূর্ণ নেকি লেখেন। আর যদি সে গুনাহের ইচ্ছা করে এবং কাজে পরিণত করে আল্লাহ একটিমাত্র গুনাহ লিখে রাখেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪৯১)

আলোচ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিফল নির্ধারণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথাও বলেছেন।

যেভাবে নির্ধারিত হয় মানুষের কর্মফল

হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী কেউ যদি ভালো কাজের নিয়ত করে, তবে সে একটি নেকি পাবে। আর তা করলে তার প্রতিদান ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

বিপরীতে কোনো বান্দা কোনো পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই তার নামে কোনো পাপ লেখা হয় না, যতক্ষণ না সে পাপ কাজ করে। বরং কেউ পাপ কাজ করার ইচ্ছা করার পর যদি তা ছেড়ে দেয়, তবে পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তাকে একটি নেকি দান করেন।

১. নেক কাজের প্রতিদান : আল্লাহ আমলকারীর জন্য নেক কাজের প্রতিদান ১০ গুণ বৃদ্ধি করে দেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার ১০ গুণ পাবে।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ১৬০)

কখনো আল্লাহ নেক কাজের প্রতিদান ৭০০ গুণ বা তার চেয়েও বেশি বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ বলেন, 'যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তাদের উপমা হলো একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রতিটি শীষে ১০০ শস্যদানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।

আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৬১)

২. নেক নিয়তের প্রতিদান : কেউ নেক কাজ করার ইচ্ছা করার পর তা কাজে পরিণত করতে না পারলেও শুধু ভালো নিয়ত করায় সে একটি পূর্ণ নেকি লাভ করবে। যেমনটি আলোচ্য হাদিসে এসেছে।

৩. গুনাহ করলে প্রতিফল : কেউ গুনাহ করলে তার জন্য কোনো বৃদ্ধি ছাড়া আল্লাহ একটি গুনাহ লিখে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কেউ কোনো গুনাহের কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ১৬০)

৪. গুনাহ ছেড়ে দিলে এক নেকি : কেউ গুনাহ করার চিন্তা করার পর যদি আল্লাহ তাআলার ভয়ে তা ছেড়ে দেয়, তবে তার জন্য একটি নেকি লিখে দেবেন। যেমনটি আলোচ্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তবে শায়খ উসাইমিন (রহ.) বলেন, 'কেউ গুনাহ করার চিন্তা করল এবং তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করল, কিন্তু তা করতে অক্ষম হলো। তখন এটা তার জন্য পূর্ণ একটি পাপ লেখা হবে।' (শরহুল আরবায়িনা লিন-নবাবিয়্যাহ, ১/৩৪২)

হাদিসের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ সর্বদা অগ্রগামী। হাদিসে যেমনটি এসেছে, 'আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের ওপর অগ্রগামী।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪৫৩)

আল্লাহ সবাইকে নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করুন এবং পাপ কাজ পরিহারের তাওফিক দিন। আমিন

মনের ইচ্ছা (ঝোঁক) ও কল্পনার গুরুত্ব

সব ধরণের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও স্বাধীন স্বেচ্ছামূলক কাজের মূলভিত্তি হলো মনের ইচ্ছা (ঝোঁক) ও চিন্তা-ভাবনা। কেননা এর থেকে কল্পনার সৃষ্টি হয় এবং কল্পনা ইচ্ছার প্রতি আহ্বান করে। ইচ্ছাশক্তি কাজ বাস্তবে সংঘটিত হওয়া কামনা করে। এভাবে বারবার হলে অভ্যাসে পরিণত হয়।

সুতরাং উপরোক্ত স্তরগুলোর সংশোধন মনের ঝোঁক ও চিন্তা-ভাবনা থেকেই শুরু হয়। মনের ঝোঁক ও চিন্তা-ভাবনা ঠিক হলে অবশিষ্ট স্তরগুলো সঠিক হয়। মনের ঝোঁক ও চিন্তা-ভাবনার সংশোধন সর্বদা এর মালিক আল্লাহ তা'আলার দেখাশুনায় হয়ে থাকে। তাঁর সন্তুষ্ট ও ভালোবাসায় তা বাড়তে থাকে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার থেকেই সব কল্যাণ, তাঁর থেকেই সব হিদায়াত, তাঁর তাওফীকেই সব পথনির্দেশনা, তাঁর অভিভাবকত্বেই বান্দার সব সংরক্ষণ ও হিফাযত, তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেওয়াতেই সব ভ্রষ্টতা, দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা। অতএব, আল্লাহর নিদর্শন, নি'আমত, তাওহীদ, তাঁকে জানার পন্থা, তাঁর 'উবুদিয়্যাতের পন্থা বুঝা, তাঁকে হাযির (উপস্থিত), বান্দার কাজে সাক্ষ্য ও প্রত্যক্ষদর্শী মনে করা, তার ওপর আল্লাহর পর্যবেক্ষণ, তার মনের সব কামনা, বাসনা, ইচ্ছা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন, এটি যখন সে বুঝবে তখন অন্যায় করতে আল্লাহর থেকে লজ্জাবোধ করবে এবং তিনি আবার তার দোষ-ত্রুটি সৃষ্টিকুলের কারো কাছে প্রকাশ করে দেয় কী না সে কারণে তাঁকে ভয় পাবে অথবা সে নিজের মনে লুকায়িত এসব দোষ-ত্রুটি নিয়ে ভাববে যে মানুষ জানতে পারলে তাকে ঘৃণা করবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে বান্দার চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা অনুসারে সে কল্যাণ, হিদায়াত ও পথনির্দেশনাপ্রাপ্ত হবে।

জেনে রাখুন, মানুষের মনের কল্পনা ও ওয়াসওয়াসার আনুসঙ্গিকতা চিন্তা-ভাবনার দিকে নিয়ে যায়, অতঃপর চিন্তা-ভাবনা তাকে উপদেশের দিকে নিয়ে যায়, উপদেশ তখন তাকে ইরাদা তথা ইচ্ছার দিকে নিয়ে যায়, অতঃপর, ইচ্ছা তাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কাজের

দিকে নিয়ে যায়, অতঃপর তা দৃঢ় হয়, ফলে তা ‘আদা তথা অভ্যাসে পরিণত হয়। অতএব, মানুষের মনের কল্পনা ও ওয়াসওয়াসাকে দৃঢ় ও পরিপূর্ণ হওয়ার পরে তা বিচ্ছিন্ন না করে মূলের দিকে ফিরানো অধিক সহজ।

তোমার মনের বাসনাকে যদি তুমি তাড়িয়ে দাও তাহলে সে তোমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে, আর যদি মনের বাসনাকে গ্রহণ করো তখন তা মনের মধ্যে ঘূর্ণয়মান চিন্তা-ভাবনা হিসেবে দেখা দিবে। অতএব, ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করো, তাহলে তা (ইচ্ছাশক্তি) ও চিন্তাশক্তি তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। আর তুমি যদি তাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হও তাহলে তা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির সাথে ফিরে যাবে।

সাবধান! শয়তানকে তোমার চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছাশক্তির স্থানে কাজ করার ক্ষমতা দিওনা; কেননা সে তোমার চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছাশক্তিকে এমনভাবে নষ্ট করবে যা বুঝা বড় কঠিন। সে তোমার অন্তরে নানা ধরণের ওয়াসওয়াসা দিবে এবং ধ্বংসাত্বক চিন্তা-ভাবনা ঢেলে দিবে। সে তোমার ও তোমার উপকারী চিন্তা-ভাবনার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তোমার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে ও তোমার ইচ্ছাশক্তিতে মালিকানা বানাতে তুমিই তাকে সাহায্য করেছ।

যার অন্তরে শয়তান বাসা বাঁধে তার সবধরণের চিন্তা-ভাবনা থেকে শয়তান বের হয় না অথবা নানা ধরণের অশ্লীলতা ও হারাম জিনিসের চিন্তা-ভাবনার অধিকারী হয় অথবা এমনসব কাল্পনিক অনুমান করে যার কোনো ভিত্তি নেই অথবা ভ্রান্ত সব চিন্তা-ভাবনার অধিকারী হয় অথবা তার জ্ঞানের পরিধির বাইরে এমন সব জিনিসের চিন্তা করে যা অনুধাবন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তখন শয়তান তার অন্তরে সেসব কাল্পনিক চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় যার কোন কূল-কিনারা নেই এবং সে এর শেষ সীমানায় পৌঁছতে পারে না। তখন তার চিন্তা-ভাবনার ময়দানে সেসব কাল্পনিক বিয়ষগুলো ঘূর্ণায়মান করতে থাকে।

এসব কিছু সংশোধনের উপায় হলো: তুমি তোমার চিন্তা শক্তিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উপকারী ভাবনার কাজে ব্যাপৃত রাখো, যেমন তাওহীদের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানসমূহ, তার অধিকারসমূহ, মৃত্যু ও এর পরবর্তী জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ, কাজের দোষ-ত্রুটি ও তা থেকে উত্তরণের উপায়, ইচ্ছাশক্তি ও প্রত্যয়েয় ক্ষেত্রে তোমার উপকারে আসে এমন সব চিন্তা-ভাবনা করো এবং যেসব জিনিস তোমাকে ক্ষতি করে সেসব জিনিসের ইচ্ছা ছুঁড়ে ফেলো।

‘আরেফীন তথা আল্লাহর পরিচয় লাভকারী আলিমদের মতে, খিয়ানতের আশা করা ও মনের চিন্তা-ভাবনায় খিয়ানতের কাজ করা অন্তরের জন্য স্বয়ং খিয়ানত করার চেয়েও অধিক মারাত্মক ও ক্ষতিকর। বিশেষ করে অন্তর যখন খিয়ানতের কাজ করে তখন অন্তরে খিয়ানতের আকাঙ্খা করা মানে এ কাজে অন্তরকে ব্যাপৃত রাখা ও খিয়ানতের দ্বারা অন্তরকে ভরে রাখা এবং তার চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছা সবকিছুই খিয়ানতের হবে।

মহান আল্লাহ মানুষের অন্তর দেখেন। এটি ঈমান, নিয়ত, ইখলাস ও বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল। পবিত্র কোরআনে ১৩২ বার ‘কলব’ (অন্তর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে দেখবেন না; বরং তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তর ও কর্ম।

’ (মুসলিম, হাদিস : ২৫৬৪)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘জেনে রেখো! শরীরের মধ্যে এমন এক টুকরা গোশত আছে, যা সুস্থ থাকলে গোটা দেহ সুস্থ থাকে, আর এটা অসুস্থ হয়ে গেলে গোটা দেহ অসুস্থ হয়ে যায়। জেনে রেখো, আর এটাই হলো অন্তর।’ (বুখারি, হাদিস : ৫২)

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়া (রহ.) বলেন, অন্তর তিন প্রকার। যথা—

সুস্থ অন্তর

পরকালে মুক্তির জন্য সুস্থ অন্তর থাকা আবশ্যক।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘কিয়ামতের দিন কোনো অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না। শুধু ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।’ (সুরা : শুআরা, আয়াত : ৮৮-৮৯)

সুস্থ অন্তর আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সামনে সব কিছু সমর্পণ করে। কুফর, শিরক, মুনাফেকি ও বিদআত থেকে দূরে থাকে।

ভালোবাসা, আস্থা, তাওবা, বিনয়, ভয়—সব আল্লাহর জন্য করে। আত্মসাৎ, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঈর্ষা, কৃপণতা, অহংকার, দুনিয়ার মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে।

অন্তরকে মৃত বানিয়ে ফেলা

অসুস্থ অন্তর

অসুস্থ অন্তর জীবিত কিন্তু রোগাক্রান্ত। মানবদেহের মতো অন্তরও রোগাক্রান্ত হয়। অসুস্থ অন্তরে ঈমান ও নিফাক উভয় থাকতে পারে।

যদি ঈমান, ইখলাস, আল্লাহর ভালোবাসা, তাওয়াক্কুল দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে সুস্থ কলবের পর্যায়ে উন্নীত হয়। আবার যদি কুপ্রবৃত্তি, হিংসা, অহংকার, শিরক ও মন্দ কাজ দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে তা মৃত অন্তরের পর্যায়ে চলে যায়। পাপে মগ্ন অন্তর অসুস্থ প্রকৃতির হয়। এর ধরনের অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে জং ধরিয়েছে। ' (সুরা : মুতাফফিফিন, আয়াত : ১৪)

মৃত অন্তর

মৃত অন্তর জীবিত অথচ নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিহীন। এ ধরনের অন্তর ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না। পাপ-পুণ্য, আলো-আঁধার তার কাছে সমান। এরা উদাসীন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা অনুধাবন করে না, তাদের চোখ আছে, তা দিয়ে দেখে না, কান আছে তা দিয়ে শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফিল—শৈথিল্যপরায়ণ।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৭৯)

আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, 'যে তার রবের জিকির করে, আর যে জিকির করে না, তাদের উপমা হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তি। ' (বুখারি, হাদিস : ৬৪০৭)

প্রতিকার : অন্তরের অসুখের প্রতিকার হলো আল্লাহমুখী হওয়া। বেশি বেশি নফল নামাজ পড়া। নিজের পাপের জন্য তাওবা করা এবং ক্রন্দন করা। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা করা। এবং আল্লাহর স্মরণে নিজেকে নিমগ্ন করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়, (তারাই আল্লাহমুখী)। জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। ' (সুরা : রাদ, আয়াত : ২৮)

যে কারনে অন্তর মরে যায়

অন্তরে গোনাহ থাকে সেখানে পবিত্র কোরআন-হাদিসের আলো, ইসলামের শিক্ষা প্রবেশ করে না। এমন অন্তরকে মৃত অন্তর বলা হয়েছে। এ কারণে বুজুর্গরা অন্তরকে গোনাহমুক্ত করে অন্তরকে সজীব ও তাজা রাখার বিষয়ে তাগিদ দিয়েছেন। নিয়মিত আমলের মাধ্যমে মানুষের অন্তর তাজা হয়। আর এমন কিছু কাজ আছে, যেগুলোর কারণে মানুষের অন্তর মারা যায় অর্থাৎ অন্তরে কোরআন-হাদিসের বাণী প্রভাব ফেলে না।

বিখ্যাত বুজুর্গ হজরত ইবরাহিম বিন আদহাম (মৃত্যু ১৬২ হিজরি) বসরার বাজার দিয়ে যাওয়ার সময় লোকজন তাকে ঘিরে ধরল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু ইসহাক! আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা দোয়া করি; কিন্তু দোয়া কবুল হয় না। তিনি বললেন, কেননা তোমাদের অন্তরগুলো মরে গেছে দশটি কারণে। সেগুলো হলো

এক. তোমরা আল্লাহর পরিচয় পেয়েছ; কিন্তু তার হক আদায় করোনি।

দুই. তোমরা বলে থাকো, তোমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসো। কিন্তু তার সুন্নত ও আদর্শকে পরিত্যাগ করেছ।

তিন. তোমরা পবিত্র কোরআন পাঠ করেছ; কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করোনি।

চার. তোমরা আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করেছ প্রতিনিয়ত, কিন্তু তার শোকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করোনি।

পাঁচ. তোমরা বলেছ যে, শয়তান তোমাদের দুশমন; কিন্তু তাকে সমর্থন করেছ সময়-সময়।

ছয়. তোমরা স্বীকৃতি দিয়েছ যে, জান্নাত সত্য; কিন্তু তার জন্য আমল করোনি।

সাত. তোমরা স্বীকৃতি দিয়েছ যে, জাহান্নাম সত্য; কিন্তু তা থেকে পলায়ন করোনি।

আট. তোমরা স্বীকার করেছ যে, মৃত্যু অবধারিত সত্য; কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করোনি।

নয়. ঘুম থেকে জেগেই তোমরা অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা শুরু করেছ; কিন্তু নিজেদের দোষের কথা বেমালুম ভুলে গেছ।

দশ. তোমরা তোমাদের মৃতদের দাফন করেছ; কিন্তু তাদের থেকে শিক্ষা নাওনি। হিলয়াতুল আওলিয়া : ৬/২৫৪

লোভ লালসার শিকার হওয়া

অধিক লাভের আশায় মানুষ লোভ করে থাকে। তবে লোভ-লালসার কারণে প্রাপ্তির থেকে হারানোর তালিকাই দীর্ঘ হয়ে থাকে। মানুষকে বিপদের মুখোমুখি করে লোভ। লোভের কারণে মানুষ এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হয় যার কোনও ক্ষতি পূরণ হয় না। তাই লোভ থেকে দূরে থাকতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, ‘যারা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম।’ (সূরা হাশর, আয়াত, ৯)

বিজ্ঞাপন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা এ জিনিসই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং পরস্পরকে রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে উসকিয়ে দিয়েছে। লোভ-লালসার কারণেই তারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে।’ (মুসলিম)।

অল্পে তুষ্টি

লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম পদ্ধতি হতে পারে অল্পে তুষ্টি। অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন করতে পারলে মানুষ নিজের যতটুকু সম্বল রয়েছে, এতেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্তি খোঁজার চেষ্টা করেন। অধিক প্রাপ্তি অথবা কোনও কিছু না পাওয়ার না থাকার গ্লানি তাকে ছুঁতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে।’ (সূরা আত-তাকাসুর : ১)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তির জীবনে আখিরাত অর্জন করাই বড় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরকে অভাব মুক্ত করে দেন। তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সম্পদকে সহজ করে দেন। আর দুনিয়া তার কাছে অপমান অপদস্থ হয়ে আসতে থাকে। আর যে ব্যক্তির জীবনে দুনিয়া অর্জন করাই বড় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দরিদ্রতা ও অভাব তার চোখের সামনে তুলে ধরেন এবং তার ওপর বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেন। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার

ভাগ্যে যতটুকু দুনিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাইরে সে দুনিয়া হাসিল করতে পারবে না।' (তিরমিজি)

আল্লাহর ভয় এবং তাকওয়া

লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকার আরেকটি উপায় হলো আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা এবং তাকওয়া অবলম্বন করা। কেউ আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন জীবন দান করবেন এমনভাবে রিজিক দেবেন, এতে তার আর কোনও টেনশন ভয় থাকবে না। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'কেউ যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহলে তিনি তার জন্যে কোনো পথ তৈরি করে দেবেন এবং তাকে তিনি এমন স্থান থেকে রিজিক দেবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। -(সূরা তালাক (৬৫), আয়াত, ২-৩)

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, ' যে ব্যক্তি মর্যাদা লাভ করতে চায়, (সে জেনে রাখুক-) সমস্ত মর্যাদা আল্লাহরই হাতে। -(সূরা ফাতির, (৩৫), আয়াত, ১০)

হিসাব দিবসে আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার ভয়

পৃথিবীতে মানুষ যা কিছুই করে, আল্লাহ তায়ালার কাছে এসবের জবাবদিহীতা করতে হবে, এই বিশ্বাস অন্তরে রাখতে হবে। হিসাব দিবসের কথা সবসময় অন্তরে থাকলে মানুষের উচ্চাকাঙ্খা কমে যাবে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও নিজের জায়গা থেকে সামনে নড়তে দেওয়া হবে না। তা হলো- ১) তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে, ২) যৌবনের সময়টা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৩) ধন সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে, ৪) এবং তা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৫) সে দ্বীনের (ইসলাম) যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী আমল করেছে কিনা বা কতটুকু করেছে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৬)

দুনিয়ার অসারতা

যেই পৃথিবীতে মানুষ বর্তমানে বসবাস করছে, যেই জীবন নিয়ে উচ্চাকাঙ্খা দেখছে, তা একদিন শেষ হয়ে যাবে। মালাকুল মাউত এসে উপস্থিত হলেই রঙরসে ভরপূর পৃথিবীর সফর শেষ হবে। এই কথা সবসময় মনে রাখতে হবে।

হজরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাকে বললেন, আমি তোমাকে দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত বস্তুসমূহ দেখাব। আমি আরয করলাম, খুব ভাল কথা। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে মদীনার একটি জঙ্গলে গেলেন। জঙ্গলের এক জায়গায় মৃত মানুষের মাথার খুলি, মল, হাড়গোড় ও ছিন্নবস্ত্র ছিল। তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা, এসব খুলি তেমনি আকাঙ্খা করত, যেমন তুমি কর এবং তেমনি আশা করত, যেমন তুমি কর; কিন্তু আজ এমন হয়ে গেছে যে, এগুলোর উপর চামড়া পর্যন্ত নেই। কিছুদিনের মধ্যেই এগুলো ভস্ম হয়ে যাবে। এই যে মল দেখছ, এগুলো তাদের খাদ্য ছিল। খোদা জানে কোথা থেকে উপার্জন করে খেয়েছিল। আজ এমন হয়ে গেছে যে, তোমার ঘৃণা হয়। আর এই ছিন্নবস্ত্র ছিল তাদের পোশাক। বায়ু একে এদিক থেকে ওদিকে উড়িয়ে ফিরে। আর এই হাড়গুলো তাদের চতুষ্পদ জন্তুর, যেগুলোর পিঠে চড়ে তারা এক শহর থেকে অন্য শহরে যেত। ক্ষণভঙ্গুর দুনিয়ার যখন এই পরিণতি, তখন এটা শিক্ষা গ্রহণেরই স্থান।

অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ ও প্রতিকার

মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব জীব নয়। সুন্দর দৈহিক অবয়বের সাথে মহান আল্লাহ মানুষকে সুন্দর একটি ক্বলব বা অন্তর দিয়েছেন। যার মাধ্যমে মানুষ চিন্তা করে জীবনের ভাল-মন্দ বেছে নেয়। মানুষের অন্তরের চিন্তা-ভাবনার উপরই নির্ভর করে তার অন্যান্য অঙ্গের ভাল কাজ বা মন্দ কাজ সম্পাদন করা। এই ক্বলব বা অন্তরেই মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস বা আক্বীদার অবস্থান। আর আল্লাহ বান্দার অন্তরই দেখেন।[1] এই ক্বলব বা অন্তর হ'ল পরিকল্পনাকারী এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বাস্তবায়নকারী। অন্তর ভাল থাকলে, মানুষের কাজও ভাল হবে।[2] অন্তর বা মন খারাপ থাকলে, কাজে মনোযোগ থাকে না। কাজ হয় অগোছালো, অসুন্দর। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় এই অন্তরেরও রোগ-ব্যাধি হয়ে থাকে। শরীরের অন্যান্য রোগের কথা মানুষ জানলেও অন্তরের রোগ সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। ফলে অধিকাংশ মানুষের অন্তর সুস্থ না থাকার কারণে পাপ কাজ করেই যাচ্ছে। আল্লাহর আযাবের কথা শুনেও কর্ণপাত করছে না। অন্তর কঠিন হওয়া অন্তরের একটি অন্যতম রোগ। অন্তর কঠিন হ'লে মানুষ আল্লাহর আযাব ও জাহান্নামের শাস্তির কথা শুনে বিগলিত হয় না। আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের আলোচনা

প্রসঙ্গে বলেন, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً 'অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন' *(বাক্বারা ২/৭৪)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَلَـكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- 'বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল' *(আন'আম ৬/৪৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُم مِّن ذِكْرِ اللهِ- 'যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে' *(যুমার ৩৯/২২)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ 'তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে' *(হাদীদ ৫৭/১৬)*।

অন্তর কঠিন হওয়ার আলামত :

(১) আল্লাহর আনুগত্য ও ভালকাজে অলসতা : মানুষের অন্তর কঠিন হ'লে ইবাদতে অলসতা চলে আসবে। ছালাত পড়বে কিন্তু অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে না। ছালাতে নফল ও সুন্নাত আদায়ের পরিমাণ কমে যাবে। মুনাফিকদের চরিত্র প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُوْنَ 'তারা ছালাতে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সংকুচিত মনে' *(তওবা ৯/৫৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى- 'যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায় তখন তারা অলসভাবে দাঁড়ায়' *(নিসা ৪/১৪২)*।

২) **অলসতা :** এটা একটা সংক্রামক ব্যাধি। অন্তর এ রোগে আক্রান্ত হ'লে শরীরের সব অঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়ে। শরীরের সব অঙ্গ কর্মক্ষমতা হারায়। আল্লাহ বলেন, أُوْلَـئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ- 'তারা হ'ল সে সমস্ত লোক যাদের অন্তর, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন' *(নাহল ১৬/১০৮)*। আল্লাহ মানুষকে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, মানুষের উচিত সেগুলি সঠিকভাবে কাজে লাগনো। অন্যথা সেই গাফেলদের জন্য আল্লাহ আযাবের ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ-

‘আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তারা তদ্বারা দেখে না। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা তারা শোনে না। তারাই হ’ল পশুর ন্যায় বরং তা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হ’লো গাফিল বা অমনোযোগী’ *(আ‘রাফ ৭/১৭৯)*।

(৩) **খারাপ বন্ধুদেরকে ভালবাসা ও তাদের সাথে উঠা-বসা করা :** কথায় আছে ‘সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ’। মানুষ যার সাথে চলাফেরা করে তার আচার-আচরণ অন্য জনের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। রাসূল (ছঃ) বলেছেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيْرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.

‘সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতার থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে’।[3]

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলব, যে কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ তাদের সাথে সাক্ষাত হয়নি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, المرء مع من احب ‘মানুষ তার সাথেই থাকবে সে যাকে ভালবাসে’।[4] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِى الْمَعَاصِى نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فِى مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

‘বনু ইসরাঈলরা যখন পাপাচারে লিপ্ত হ’ল, তখন তাদের আলেম দরবেশগণ প্রথমদিকে এইসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করত। কিন্তু লোকেরা বিরত না হওয়ায় পরে তারা দুষ্টমতি সমাজ নেতা ও বড়লোকদের সাথে উঠা-বসা ও খানাপিনা করত। ফলে আল্লাহ তাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপাচারে কুলষিত করে দেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের উপর লা‘নত করেন’।[5]

(৪) **অধিক হারে গুনাহ ও খারাপ কাজ করা :** অধিক হারে পাপ বান্দার অন্তরকে কঠিন করে তোলে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَ اللهُ)كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(

'যখন বান্দা কোন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যখন সে তওবা করে, তখন সেটা তুলে নেওয়া হয়। আর ইস্তেগফারের মাধ্যমে অন্তরকে পরিষ্কার করা হয়। আর যদি পাপ বাড়তেই থাকে, তাহ'লে দাগও বাড়তে থাকে। আর এটাই হ'ল মরিচা। যেমন আল্লাহ বলেন, না এটা সত্য নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১৪)আহমাদ, তিরমিযী*

(৫) মৃত্যুর কষ্ট ও আখেরাতের আযাব ভুলে যাওয়া : মৃত্যু ও আখেরাতের চিন্তা মানুষের অন্তরকে নরম রাখে। কেউ মৃত্যুর কথা ও আখেরাতে জবাবদিহিতার কথা ভুলে গেলে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়।

অন্তর কঠিন হওয়ার প্রতিকার :

(১) আল্লাহ তা'আলাকে চেনা : অন্তর কঠিন হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রথম ও প্রধান উপায় হ'ল আল্লাহর রহমত, ক্ষমা, শাস্তি ও মর্যাদা জানার মাধ্যমে অন্তর নরম করার চেষ্টা করা এবং আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের জন্য ছুটে আসা। আল্লাহ বলেন, غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ- 'পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন' *(গাফির ৪০/ ৩)*।

(২) কুরআন তিলাওয়াত করা : কুরআন তিলাওয়াত করা ও এর অর্থ বুঝে আমল করার মাধ্যমে অন্তর নরম হয়। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ '(বিনয়ী হ'ল তারা) যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হ'লে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে' (হজ্জ ২২/৩৫)। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) কুরআন দ্বারা কঠিন অন্তরের কিভাবে চিকিৎসা করতে হবে তা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন এভাবে- 'এটির দু'টি পথ রয়েছে- এক- আপনার অন্তরকে দুনিয়া থেকে স্থানান্তর করে আখেরাতের দেশে নিয়ে যাবেন। দুই- অতঃপর কুরআনের অর্থ বুঝবেন এবং কেন নাযিল হয়েছে সেটা বুঝার চেষ্টা করবেন এবং প্রত্যেক আয়াত হ'তে আপনার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে তা আপনার

অন্তরের ব্যধির উপর প্রয়োগ করবেন। তা যদি আপনার অসুস্থ অন্তরের উপর প্রয়োগ করেন, তাহ’লে আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করবেন’।[6]

(৩) অন্তরকে পরকালীন চেতনায় উজ্জীবিত করা : অন্তরকে বুঝাতে হবে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরে রয়েছে স্থায়ী, অনাদি, অনন্ত আখিরাতের জীবন। সে জীবনের তুলনায় এ নশ্বর জীবন নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

.والله مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ

‘আল্লাহর কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ’ল যেমন তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দেয়, এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল’।[7]

জাবের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি কানকাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে একে এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে পসন্দ করবে’? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তো একে কোন কিছুর বিনিময়েই ক্রয় করতে পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ‘আল্লাহর কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট’।[8]

(৪) মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার কথা চিন্তা করা : দুনিয়ার জীবনের পর সবাইকে মরতে হবে এবং দুনিয়ার জীবনের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। এ চিন্তা ও বিশ্বাসই মানুষর অন্তর নরম করতে পারে। মরণের পর কবরে যেতে হবে, মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, হাশরের ময়দানে আমলনামা নিয়ে উঠতে হবে, আমল ভাল হ’লে জান্নাত, না হয় জাহান্নাম। একথা চিন্তা ও বিশ্বাসের মাধ্যমেই অন্তর নরম হয়। পক্ষান্তরে সে যদি পরকালের জবাবদিহিতার কথা ভুলে যায়, তাহ’লে তার অন্তর দুনিয়ার মায়ায় আচ্ছাদিত হয়ে কঠিন হয়ে যায়।

(৫) কবর যিয়ারত করা ও তাদের অবস্থা চিন্তা করা : কোন মানুষ যদি কবরের কাছে গিয়ে এই চিন্তা করে যে, এই কবরে যে আছে সে একদিন দুনিয়াতে ছিল, আমার মত খাওয়া-দাওয়া করত, চলাফেরা করত। আজকে সে কবরে চলে গেছে, তার দেহ মাটি হয়ে গেছে, তার সম্পদ তার ছেলে-মেয়েরা ভাগ করে নিয়েছে। আমাকেও একদিন তার মত কবরে যেতে হবে। তাহ'লে অন্তর নরম হবে। রাসূল (ছঃ) বলেছেন, كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلاَ فَزُوْرُوْهَا، فَإِنَّهَا تَرِقُ الْقَلْبَ. 'আমি প্রথমে তেমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা এটা অন্তরকে নরম করে'।[

অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ ও প্রতিকার

মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব জীব নয়। সুন্দর দৈহিক অবয়বের সাথে মহান আল্লাহ মানুষকে সুন্দর একটি ক্বলব বা অন্তর দিয়েছেন। যার মাধ্যমে মানুষ চিন্তা করে জীবনের ভাল-মন্দ বেছে নেয়। মানুষের অন্তরের চিন্তা-ভাবনার উপরই নির্ভর করে তার অন্যান্য অঙ্গের ভাল কাজ বা মন্দ কাজ সম্পাদন করা। এই ক্বলব বা অন্তরেই মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস বা আক্বীদার অবস্থান। আর আল্লাহ বান্দার অন্তরই দেখেন।[1] এই ক্বলব বা অন্তর হ'ল পরিকল্পনাকারী এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বাস্তবায়নকারী। অন্তর ভাল থাকলে, মানুষের কাজও ভাল হবে।[2] অন্তর বা মন খারাপ থাকলে, কাজে মনোযোগ থাকে না। কাজ হয় অগোছালো, অসুন্দর। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় এই অন্তরেরও রোগ-ব্যাধি হয়ে থাকে। শরীরের অন্যান্য রোগের কথা মানুষ জানলেও অন্তরের রোগ সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। ফলে অধিকাংশ মানুষের অন্তর সুস্থ না থাকার কারণে পাপ কাজ করেই যাচ্ছে। আল্লাহর আযাবের কথা শুনেও কর্ণপাত করছে না। অন্তর কঠিন হওয়া অন্তরের একটি অন্যতম রোগ। অন্তর কঠিন হ'লে মানুষ আল্লাহর আযাব ও জাহান্নামের শাস্তির কথা শুনে বিগলিত হয় না। আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً 'অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন' *(বাক্বারা ২/৭৪)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَلَـكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- 'বস্ত্ততঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল' *(আন'আম ৬/৪৩)*। অন্যত্র

আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُم مِّن ذِكْرِ اللهِ- 'যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে' *(যুমার ৩৯/২২)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ 'তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে' *(হাদীদ ৫৭/১৬)*।

অন্তর কঠিন হওয়ার আলামত :

(১) আল্লাহর আনুগত্য ও ভালকাজে অলসতা : মানুষের অন্তর কঠিন হ'লে ইবাদতে অলসতা চলে আসবে। ছালাত পড়বে কিন্তু অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে না। ছালাতে নফল ও সুন্নাত আদায়ের পরিমাণ কমে যাবে। মুনাফিকদের চরিত্র প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُوْنَ 'তারা ছালাতে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সংকুচিত মনে' *(তওবা ৯/৫৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى- 'যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায় তখন তারা অলসভাবে দাঁড়ায়' *(নিসা ৪/১৪২)*।

(২) আল্লাহর আয়াত ও উপদেশ শুনে অন্তর প্রভাবিত না হওয়া : অন্তর কঠিন হ'লে মানুষ কুরআনের আয়াত শুনে বিশেষ করে আযাবের আয়াতগুলি শুনে ভীত হয় না; বরং কুরআন পড়া ও শোনাকে নিজের কাছে ভারী মনে হয়। আল্লাহ বলেন, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيْدِ 'অতএব যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন' *(ক্বাফ ৫০/৪৫)*। অন্যত্র আল্লাহ মুমিনদের প্রশংসা করে বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ- 'যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াত, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা করে' *(আনফাল ৮/ ২)*।

(৩) দুনিয়াতে আল্লাহর আযাব-গযব ও মানুষের মৃত্যু দেখে অন্তর ভীত না হওয়া : মানুষ সাধারণত আযাব-গযব ও নিকটজনের মৃত্যু দেখলে ভীত হয়। কিন্তু কেউ যদি ভীত না হয়, ভাল আমল না করে, খারাপ আমল ছেড়ে না দেয়, তাহ'লে বুঝতে হবে তার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন, أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً

أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوْبُوْنَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ 'তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতিবছর তারা দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না' *(তওবা ৯/১২৬)*।

(৪) দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়া ও আখেরাতকে ভুলে যাওয়া : মুমিনদের আসল বাসস্থান হ'ল জান্নাত। দুনিয়া হ'ল আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। যদি কেউ আখেরাতের কথা ভুলে দুনিয়া অর্জনের পিছনে লেগে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে তার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।

(৫) আল্লাহকে সম্মান করা কমে যাওয়া : আল্লাহকে সম্মান না করার অর্থ হ'ল আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে মান্য না করা। সুতরাং কেউ আল্লাহর আদেশকে মান্য না করে নিষেধগুলিতে ডুবে থাকলে বুঝতে হবে লোকটির অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।

অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ :

অন্তর কঠিন হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হ'ল।-

(১) অন্তরকে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত রেখে আখেরাতকে ভুলিয়ে রাখা : এটা হচ্ছে অন্তর কঠিন হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। যদি দুনিয়ার ভালবাসা আখেরাতের ভালবাসার চেয়ে প্রাধান্য পায়, তাহ'লে ধীরে ধীরে অন্তর কঠিন হ'তে আরম্ভ করে। ফলে ঈমান কমে যায়, সৎ কাজকে ভারী মনে হয়, দুনিয়াকে ভালবাসা আরম্ভ করে এবং আখেরাতকে ভুলে যেতে থাকে। জনৈক সৎ বান্দা বলেছেন,

ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أرد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبصر بهما ما وعد الله بالغيب، وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما فيه، ثم قرأ-

'প্রত্যেক বান্দারই দু'টি চোখ রয়েছে। এক চোখ দিয়ে সে দুনিয়ার বিষয় দেখে। আর অন্তরে যে চোখ আছে তা দিয়ে সে আখেরাতের বিষয় দেখে। আল্লাহ যদি কোন বান্দার কল্যাণ চান, তাহ'লে তার অন্তরে যে চোখ আছে তা খুলে দেন। ফলে আল্লাহ অদৃশ্যের যে ওয়াদা করেছেন সে সেগুলি দেখতে থাকে। আর আল্লাহ যদি অন্য কিছু ইচ্ছা করেন, তাহ'লে তার অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেন। তারপর এ আয়াতটি পাঠ করেন, 'তাদের অন্তর কি তালাবদ্ধ করা হয়েছে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

(২) **অলসতা :** এটা একটা সংক্রামক ব্যাধি। অন্তর এ রোগে আক্রান্ত হ'লে শরীরের সব অঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়ে। শরীরের সব অঙ্গ কর্মক্ষমতা হারায়। আল্লাহ বলেন, أُوْلَـئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ- 'তারা হ'ল সে

সমস্ত লোক যাদের অন্তর, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন' *(নাহল ১৬/১০৮)*। আল্লাহ মানুষকে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, মানুষের উচিত সেগুলি সঠিকভাবে কাজে লাগনো। অন্যথা সেই গাফেলদের জন্য আল্লাহ আযাবের ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ-

'আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তারা তদ্বারা দেখে না। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা তারা শোনে না। তারাই হ'ল পশুর ন্যায় বরং তা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হ'লো গাফিল বা অমনোযোগী' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

(৩) **খারাপ বন্ধুদেরকে ভালবাসা ও তাদের সাথে উঠা-বসা করা :** কথায় আছে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। মানুষ যার সাথে চলাফেরা করে তার আচার-আচরণ অন্য জনের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। রাসূল (ছঃ) বলেছেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيْرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.

'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতার থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে'।[3]

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলব, যে কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ তাদের সাথে সাক্ষাত হয়নি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, المرء مع من احب 'মানুষ তার সাথেই থাকবে সে যাকে ভালবাসে'।অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِى الْمَعَاصِى نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فِى مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

'বনু ইসরাঈলরা যখন পাপাচারে লিপ্ত হ'ল, তখন তাদের আলেম দরবেশগণ প্রথমদিকে এইসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করত। কিন্তু লোকেরা বিরত না হওয়ায় পরে তারা দুষ্টমতি সমাজ নেতা ও বড়লোকদের সাথে উঠা-বসা ও খানাপিনা করত। ফলে আল্লাহ তাদের

পরস্পরের অন্তরকে পাপাচারে কুলষিত করে দেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের উপর লা‘নত করেন’।

আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপের কারণে মানুষের অন্তর কঠোর হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে, ‘অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, তা পাষাণ কিংবা তার চেয়ে বেশি কঠিন...।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ৭৪)

অন্তর কঠিন হওয়ার অনেক কারণ আছে। নিম্নে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো—

অন্তরকে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত রাখা : যদি অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা আখিরাতের ভালোবাসার চেয়ে প্রাধান্য পায়, তাহলে ধীরে ধীরে অন্তর কঠিন হতে শুরু করে।

ফলে ঈমান কমে যায়, সৎকাজকে ভারী মনে হয়, দুনিয়াকে ভালোবাসা শুরু করে এবং আখিরাতকে ভুলে যেতে থাকে। ইরশাদ হয়েছে, ‘কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।’ (সুরা : আলা, আয়াত : ১৬-১৭)

গাফিলতি ও উদাসীনতা : গাফিলতি একটি সংক্রামক ব্যাধি।

অন্তর এ রোগে আক্রান্ত হলে শরীরের সব অঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়ে। শরীরের সব অঙ্গ কর্মক্ষমতা হারায়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে উপলব্ধি করে না।

তাদের চোখ রয়েছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। এরা হলো পশুর মতো, বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। তারাই হলো গাফিল বা অমনোযোগী।’ (সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৭৯)

অসৎসঙ্গীদের সঙ্গে ওঠাবসা করা : মানুষ যার সঙ্গে চলাফেরা করে, তার আচার-আচরণ অন্যজনের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে।

রাসুল (সা.) বলেছেন, সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর উদাহরণ আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের মতো। আতর বিক্রেতার থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয়তো তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয়তো তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে। (বুখারি, হাদিস : ২১০১)

পাপ ও খারাপ কাজ বেশি করা : বেশি পরিমাণ পাপ বান্দার অন্তরকে কঠিন করে তোলে। রাসুল (সা.) বলেছেন, যখন বান্দা কোনো পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি

কালো দাগ পড়ে যায়। যখন সে তাওবা করে, তখন সেটি তুলে নেওয়া হয়। আর ইস্তিগফারের মাধ্যমে অন্তরকে পরিষ্কার করা হয়। আর যদি পাপ বাড়তে থাকে, তাহলে দাগও বাড়তে থাকে। আর এটিই হলো মরিচা। যেমন—আল্লাহ বলেন, না, এটি সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের ওপর মরিচারূপে জমে গেছে। [(সুরা : মুতাফফিফিন, আয়াত : ১৪), আহমাদ ও তিরমিজি]

মৃত্যুর কথা ভুলে যাওয়া : মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তা মানুষের অন্তরকে নরম রাখে। কেউ মৃত্যুর কথা ও আখিরাতে জবাবদিহির কথা ভুলে গেলে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়।

কঠিন অন্তর চেনার উপায়

কঠিন অন্তর চেনার কয়েকটি উপায় আছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো—

ইবাদতে অলসতা : মানুষের অন্তর কঠিন হলে ইবাদতে অলসতা চলে আসবে। সালাত পড়তে মন চাইবে না কিংবা সালাত পড়লেও অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে না। সালাতে নফল ও সুন্নত আদায়ের পরিমাণ কমে যাবে। মোনাফেকদের চরিত্র প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'তারা সালাতে আসে অলসতার সঙ্গে আর ব্যয় করে সংকুচিত মনে।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ৫৪)

উপদেশ শুনে অন্তর প্রভাবিত না হওয়া : অন্তর কঠিন হলে মানুষ কোরআনের আয়াত কিংবা দ্বিনি উপদেশ শুনে, বিশেষ করে আজাবের কথা শুনে ভীত হয় না, বরং কোরআন পড়া ও শোনাকে নিজের কাছে ভারী মনে হয়। মহান আল্লাহ মুমিনদের প্রশংসা করে বলেন, 'যারা ঈমানদার, তারা এমন যে যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াত, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রতি ভরসা করে।' (সুরা : আনফাল, আয়াত : ২)

দুনিয়ায় আজাব-গজব দেখে অন্তর ভীত না হওয়া : মানুষ সাধারণত আজাব-গজব ও আপনজনের মৃত্যু দেখলে ভীত হয়। কিন্তু কেউ যদি ভীত না হয়, ভালো আমল না

করে, খারাপ আমল ছেড়ে না দেয়, তাহলে বুঝতে হবে তার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তারা কি লক্ষ করে না, প্রতিবছর তারা দু-একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ তারা এর পরও তাওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না।’ (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১২৬)

দ্বিনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে যাওয়া : যার অন্তর নরম, তার অন্তরে দ্বিনের প্রতি, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে। ফলে ইবাদত করা ওই ব্যক্তির জন্য সহজ হয়। কিন্তু যার অন্তর কঠোর হয়ে গেছে, তার অন্তর থেকে দ্বিনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়। ফলে দ্বিন-ধর্মের কথা তার কাছে ভালো লাগে না। তার অন্তরে ধর্মের ব্যাপারে অনীহা তৈরি হয়।

মহান আল্লাহ আমাদের অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া থেকে হেফাজত করুন। আমিন।